আরেক রকম

ষষ্ঠ বর্ষ দশম সংখ্যা
১৬-৩১ মে ২০১৮ ১-১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫

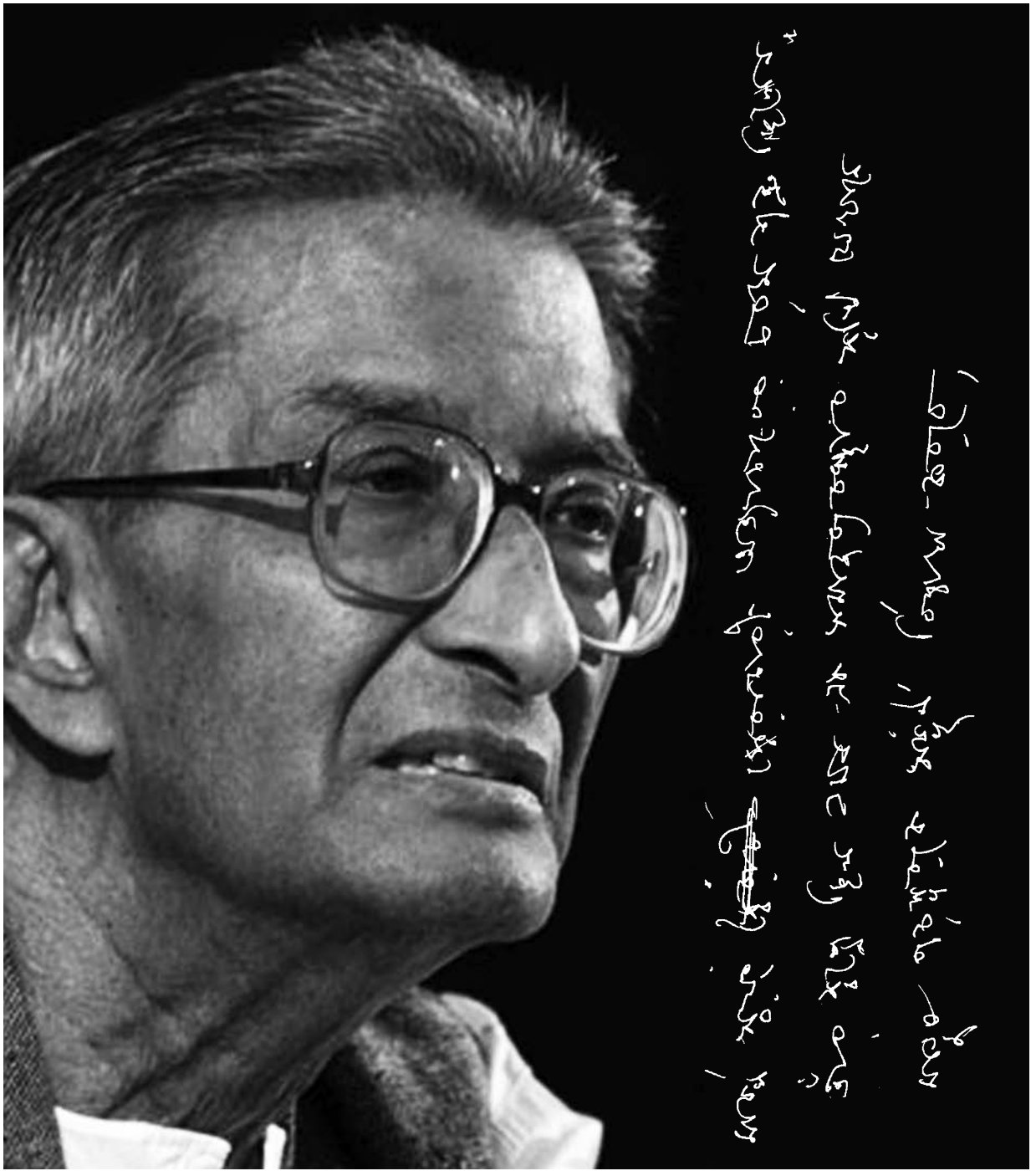

মূল্য : ২০ টাকা

আরেক রকম

পাক্ষিক পত্রিকা, মাসের ১লা ও ১৬ই প্রকাশিত
স্বত্বাধিকারী : সমাজ চর্চা ট্রাস্ট
সম্পাদক
গৌরী চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদকীয় দপ্তর : ফ্ল্যাট ৩এ, সোনালি অ্যাপার্টমেন্টস
৮/২এ আলিপুর পার্ক রোড, কলকাতা ৭০০ ০২৭

প্রতি সংখ্যা ২০ টাকা
বার্ষিক সডাক ৫০০ টাকা

এককালীন ৫০০০.০০ টাকা দিয়ে 'সমাজ চর্চা ট্রাস্ট'-এর সদস্য হলে তাঁকে *আরেক রকম*-এর স্থায়ী গ্রাহক করে নেওয়া হবে।

arekrakam@gmail.com
samajcharcha@gmail.com

স্বত্বাধিকারী
সমাজ চর্চা ট্রাস্ট
কমার্শিয়াল কমপ্লেকস (চতুর্থ তল)
৮১/২/৭ ফিয়ার্স লেন
কলকাতা ৭০০ ০১২

গ্রাহক পরিষেবা
রবিন মজুমদার - ৯৪৩২২১৯৪৪৬

আরেক রকম

ষষ্ঠ বর্ষ দশম সংখ্যা ১৬-৩১ মে ২০১৮,
১-১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫
Vol. 6, Issue 10th, Arek Rakam RNI No. WBBEN/2013/49896

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক: অশোক মিত্র

সম্পাদক
গৌরী চট্টোপাধ্যায়

সহযোগী সম্পাদক
শুভনীল চৌধুরী

সম্পাদকমণ্ডলী
কালীকৃষ্ণ গুহ
প্রণব বিশ্বাস
ইমানুল হক
শাক্যজিৎ ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ
নামলিপি: হিরণ মিত্র

পরিবেশক
বিশাল বুক সেন্টার
৪ টোটি লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৬
ফোন : ০৩৩-৪০৬৪-৪০৯৭, ৪১০৩, ৬৩৫৩

বাংলাদেশ পরিবেশক
পাঠক সমাবেশ
শাহবাগ, ঢাকা ১০০০

আরেক রকম পত্রিকার জন্য যোগাযোগ স্থল
শিলিগুড়ি : নন্দদুলাল দেবনাথ, ৯৪৭৪৩৮৩৪৪২
বোলপুর : সোমনাথ সমাদ্দার, ৯৪৭৫৩৬৩৩৫২

ওয়েব সাইট : www.arekrakam.com

প্রতি সংখ্যা কুড়ি টাকা
বার্ষিক সডাক পাঁচশো টাকা

এককালীন ৫০০০.০০ টাকা দিয়ে 'সমাজ চর্চা ট্রাস্ট'-এর সদস্য হলে *আরেক রকম* আজীবন বিনামূল্যে পাওয়া যাবে।

সূ ◆ চি ◆ প ◆ ত্র

সম্পাদকীয়
অশোক মিত্র ৫
আরেক রকম ১০
আমাদের অশোকদা
অমিয়কুমার বাগচী ১৩
মিত্র অশোক
আজিজুর রহমান খান ১৭
অশোক মিত্র: একটি ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ
জয়তী ঘোষ ১৯
অশোককাকা
অভিরূপ সরকার ২২
১ মে ২০১৮
অমিয় দেব ২৬
স্নেহের দায়বদ্ধতা এবং একটি মানুষ
নবনীতা দেব সেন ২৮
একটি যুগের স্মৃতি
সুপ্রিয়া চৌধুরী ৩০
শিকড়ের প্রতি যত্নশীল
যশোধরা রায়চৌধুরী ৩২
অশোক মিত্র: কুকথার স্বত্ববিলোপ
সুমন ভট্টাচার্য ৩৪
ভদ্রলোক এবং কমিউনিস্ট ও কিছু তেতো কথা
ইমানুল হক ৩৭
আলো ক্রমে আসিতেছে
শাক্যজিৎ ভট্টাচার্য ৪০
আপোশহীন অশোক মিত্র
শুভনীল চৌধুরী ৪৪
রাজনৈতিক বিশ্বাসে অবিচল বহুমুখী চিন্তক
সুজিত পোদ্দার ৪৮
অক্ষয়বটের দেশ
একজন মার্কসবাদী চিন্তকের ব্যক্তিবিশ্ব
কালীকৃষ্ণ গুহ ৫৩
পুনঃপাঠ
একটি কাহিনি, একটি প্রস্তাব
অশোক মিত্র ৫৬

সমাজ চর্চা ট্রাস্ট-এর পক্ষে তৃষিতানন্দ রায় কর্তৃক ফ্ল্যাট ৩এ, ৮/২এ আলিপুর পার্ক রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক এস. পি. কমিউনিকেশনস্ প্রা. লি., ৩১বি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

Social Scientist

সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে তথ্যনির্ভর চিন্তাশীল প্রবন্ধসমষ্টি। বছরে ছ'টি সংখ্যা। কয়েক দশক ধরে প্রকাশিত হচ্ছে।

চাঁদার হার

এক বছর : ৩০০ টাকা

দুই বছর : ৫০০ টাকা

তিন বছর : ৬০০ টাকা

সম্পাদক

প্রভাত পট্টনায়ক

সম্পাদকমণ্ডলী

মধু প্রসাদ, উৎসা পট্টনায়ক, বি. রঘুনন্দন

সি. পি. চন্দ্রশেখর, জয়তী ঘোষ, বিশ্বময় পতি

সম্পাদকীয় দপ্তর

৩৫এ/১ শাহপুর জাট

নতুন দিল্লি ১১০০৪৯

আরেক রকম

সম্পাদকীয়

অশোক মিত্র

(১০ এপ্রিল ১৯২৮-১ মে ২০১৮)

'আরেক রকম' আকাশের সুর্য অস্তমিত। আমাদের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, 'আরেক রকম' পত্রিকার প্রাণপুরুষ, অশোক মিত্র প্রয়াত হলেন ১মে। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। ১ এপ্রিল, শারীরিক সমস্যার কারণে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় তাঁকে। কিন্তু হাসপাতালে ভর্তির দিন সকালেও তিনি সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যের সঙ্গে আলোচনা করেন 'আরেক রকম'-এর লেখাপত্র নিয়ে, আরেকটি নিবন্ধ তিনি রচনা করতে চেয়েছিলেন সেদিন। কিন্তু আর সেই নিবন্ধ লেখা হল না, হাসপাতাল থেকে ফেরা হল না তাঁর।

জীবনের নবম দশকে পা দিয়েও যে অদম্য জেদ ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে তিনি ও শঙ্খ ঘোষ 'আরেক রকম' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা আগামী দিনে আমাদের অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। জীবনের সায়াহ্নে পৌঁছেও, অবক্ষয়ী সমাজ, রাজনীতি, মূল্যবোধের বিরুদ্ধে যে কলম ধরা যায়, অন্যদের অনুপ্রাণিত করা যায়, তার প্রমাণ অশোক মিত্র ও শঙ্খ ঘোষের মতন মানুষের এই প্রয়াস। দিনের পর দিন, 'আরেক রকম' পত্রিকার জন্য অশোক মিত্র সম্পাদকীয় লিখেছেন, নিজস্ব কলাম লিখেছেন, অন্যদের লেখার জন্য তাগাদা দিয়েছেন, এমন একটা অবস্থায় যখন তিনি প্রায় অন্ধ, শারীরিকভাবে অসুস্থ। কেন করেছেন? কীসের তাগিদে? কারণ তিনি মনে করতেন,

> 'সার্বিক অধোগমনের প্রবণতাকে ললাটলিখন বলে মেনে নিয়ে হাত-পা গুটিয়ে মহাপ্রলয়ের বিশেষ মুহূর্তটির জন্য প্রতীক্ষায় থাকা মহাপাতকের সমার্থক, প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ার দায়িত্ব আমাদেরই বহন করতে হবে, যে যেখানে অবস্থান করছি, আমাদের প্রত্যেককে।' (*আরেক রকম*-এর প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত অশোক মিত্রের নিবেদন, যা এই সংখ্যায় পুনঃপ্রকাশিত)

'আরেক রকম' সেই প্রতিরোধের সলতে পাকানোর কাজ করবে, এটাই ছিল তাঁর প্রতীতি, তাঁর আকাঙ্ক্ষা। অশোক মিত্রের সমগ্র জীবন সেই প্রতিরোধের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। অর্থনীতি, রাজনীতি, শিল্প, সাহিত্য, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তাঁর কাজের মধ্যে রয়ে গেছে সেই প্রতিরোধের বার্তা।

অশোক মিত্র জন্মগ্রহণ করেন ১০ এপ্রিল ১৯২৮ তারিখে পূর্ব-বাংলায়। ঢাকার আর্মেনিটোলা স্কুলে তাঁর প্রথম ছাত্রজীবন। ছোটবেলা থেকেই মেধাবী ছাত্র হিসেবে তাঁর পরিচিতি। আর্মেনিটোলা স্কুল থেকে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে জগন্নাথ কলেজ থেকে আই.এ. পাশ করে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি নিয়ে স্নাতক স্তরে প্রথম স্থানাধিকার। তারপরে, দেশভাগের টালমাটাল পরিস্থিতি ও ছাত্র আন্দোলনে জড়িত থাকার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে ভর্তি নিয়ে অনিশ্চয়তা, সুতরাং তাঁকে কলকাতা চলে আসতে হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ভর্তি করতে অস্বীকার করায় তিনি অর্থনীতিবিদ অমিয় কুমার দাশগুপ্তের ব্যবস্থাপনায় কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পাঠক্রমে ভর্তি হন, এবং সেখানেও যথারীতি প্রথম স্থান লাভ করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপরে, কিছুদিন লখ্‌নৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার পরে গবেষণার জন্য তিনি পাড়ি দেন হল্যান্ডে, যেখানে ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল স্টাডিজ নামক সদ্য প্রতিষ্ঠিত সংস্থায়, বিশ্ববিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও অর্থশাস্ত্রে প্রথম নোবেল পুরস্কারজয়ী ইয়ান টিনবার্গেনের তত্ত্বাবধানে তাঁর পিএইচডি ডিগ্রি লাভ।

অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে তাঁর পি.এইচ.ডি.-র গবেষণা— আয়ের বন্টন। বিশেষ করে, উৎপাদিত আয়ে শ্রমিকদের অংশ কীভাবে নির্ধারিত হয়, তা নিয়ে তাঁর গবেষণা। পোল্যান্ডের মার্কসবাদী অর্থনীতিবিদ মিখাইল কালেস্কির এই সংক্রান্ত গবেষণাকে তিনি আরো বিস্তৃত করেন। কালেস্কি দেখিয়েছিলেন যে বাজারে যদি অল্প কয়েক জন উৎপাদকের মধ্যে প্রতিযোগিতা সীমিত থাকে (oligopoly) তবে পণ্যের দাম ঠিক করার ক্ষমতা উৎপাদকের থাকে, সেই মূল্যেই গ্রাহককে পণ্য কিনতে হয়, কারণ বিকল্প উৎপাদকের সংখ্যা বাজারে কম। এমতাবস্থায়, যদি শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে সংগঠিতভাবে মজুরি বাড়াতে চান, তবে, পুঁজিপতিরা পণ্যের দাম বাড়িয়ে শ্রমিকদের প্রকৃত আয়-কে বাড়তে না দিয়ে, উৎপাদনে তাদের ভাগকে অপরিবর্তনীয় রাখতে পারে। প্রশ্ন, তাহলে ট্রেড ইউনিয়ন কীভাবে মোট আয়ে শ্রমিকদের অংশ বাড়াতে পারে? আর সেই অংশ বাড়াতে যদি ট্রেড ইউনিয়ন অক্ষম হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে পুঁজিপতিরা খড়্গহস্ত কেন? এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দেন অশোক মিত্র। তাঁর গবেষণায় তিনি প্রমাণ করেন যে ট্রেড ইউনিয়ন শক্তিশালী হয়ে উঠলে, বাজারে প্রতিযোগিতার যে কাঠামো তার পরিবর্তন হয়। সুতরাং, ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষমতা বাড়লে, খরচের উপরে যত বাড়তি মুনাফা (degree of monopoly) ধরে পণ্যের দাম নির্ধারণ হয়, সেই ব্যবধান কমে, এবং মোট উৎপাদনের মধ্যে শ্রমিকদের অংশ বাড়ে। আয়ের বন্টন নিয়ে অর্থনৈতিক গবেষণায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক, ড. মিত্রের এই প্রতিপাদ্য যা তাঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি প্রদান করে। অর্থশাস্ত্রের নানান গাণিতিক কচকচানির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ না রেখে, গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেন তিনি। তাঁর কৃত প্রথম গবেষণার মধ্য দিয়েই তিনি জানান দেন যে আগামী দিনে তাঁর জীবন শ্রমিক, খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থে নিয়োজিত হতে চলেছে।

তাই বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় ও আর্থিক সংস্থায় কর্মজীবন শুরু করলেও, দেশের পরিকল্পনাভিত্তিক অর্থব্যবস্থাকে আরো দৃঢ় ও নিপুণভাবে লাগু করার উদ্দেশ্যে, তাঁর প্রজন্মের অনেক অর্থনীতিবিদের মতন তিনিও ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও নীতি নির্ধারণ সংস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মাত্র ৩৮ বছর বয়সে সদ্য গঠিত কৃষি পণ্য মূল্য কমিশনের সভাপতি। ওঁর হাত ধরেই কৃষি কমিশনের অধিকাংশ রূপরেখা তৈরি হয়। আবার মাত্র ৪২ বছর বয়সে তিনি কেন্দ্রে ইন্দিরা গান্ধী সরকারের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পদে নিযুক্ত হন। দেশের অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা তৈরি করতে তাঁর এই দুটি অভিজ্ঞতাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু, অশোক মিত্র শুধুমাত্র একজন অর্থনৈতিক নীতি-নির্ধারক ও আমলা ছিলেন না। তিনি ছিলেন গণতান্ত্রিক আন্দোলন, খেটে খাওয়া মানুষের সংগ্রামের একজন সহমর্মী যোদ্ধা। তাই, পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নামিয়ে আনার প্রতিবাদে এবং ১৯৭২ সালের নির্বাচনে ব্যাপক রিগিং-এর বিরোধিতায় তিনি মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টার পদ ত্যাগ করেন। সেই পদে ওনার উত্তরসূরি মনমোহন সিংহ, যিনি পরে দেশের প্রধানমন্ত্রী পদে নির্বাচিত হন। এর থেকেই বোঝা যায়, নীতির প্রশ্নে নিজের আদর্শের প্রশ্নে অবিচল থাকার জন্য অশোক মিত্র কী ত্যাগ করেন, কোন সংগ্রামী জীবন বেছে নেন।

মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পদ থেকে পদত্যাগ করার পরে তিনি আবারও ফিরে যান ইকনমিক পলিটিক্যাল উইকলি-র জন্য তাঁর কলাম লেখার কাজে, যা Calcutta Diary নামে প্রবল সমাদৃত হয়। একইসঙ্গে তিনি লিখতে থাকেন অর্থনীতি সংক্রান্ত তাঁর বিখ্যাত বই Terms of Trade and Class Relations in India. Calcutta Diary— যা পরবর্তীকালে লন্ডন থেকে বই আকারে প্রকাশিত হয়— হয়ে ওঠে কংগ্রেসের স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে এক জ্বলন্ত বিদ্রোহ। অশোক মিত্র, হয়তো একমাত্র চিন্তক যিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ১৯৭২ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের নেতৃত্বে যে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নামিয়ে আনা হয়েছিল, তা ছিল ১৯৭৫-এর জরুরি অবস্থার পূর্বসূরী। সেই সময়ে লেখা তাঁর এই প্রবন্ধগুলি হাজারো মানুষকে অনুপ্রেরণা জোগায়। হাজারো রাজনৈতিক কর্মীকে বিনা বিচারে জেলে বন্দি করে রাখার বিরুদ্ধে, বাম কর্মীদের নির্মমভাবে হত্যার প্রতিবাদে, অশোক মিত্রের কলম হয়ে ওঠে প্রতিরোধ, যা অসংখ্য তরুণ বুদ্ধিজীবী ও বামপন্থীদের অনুপ্রেরণা জোগায়। জরুরি অবস্থার ভয়াবহতা, একজন প্রাবন্ধিকের একটি গোটা সমাজব্যবস্থা ও অত্যাচারী সরকারের বিরুদ্ধে আগুন জ্বালাতে পারার ক্ষমতা, বুঝতে হলে Calcutta Diary পড়া আবশ্যিক।

আবার, কৃষি কমিশনে কাজ করার অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে তিনি লেখেন তাঁর অসামান্য বই, Terms of Trade and Class Relations in India বইটি ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত হয়। অর্থনৈতিক তত্ত্বের দিক দিয়ে উনি দুটি প্রবণতার একটি ঐক্যবদ্ধ ব্যাখ্যা দেন। প্রথমত, ১৯৬০-এর দশক থেকেই ভারতবর্ষে শিল্পে মন্দার ছায়া। কিন্তু মন্দাবস্থার মধ্যেও ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধি, যার বিরুদ্ধে দেশজুড়ে বিক্ষোভ, অনেকে মনে করেন সেই বিক্ষোভকে শায়েস্তা করার জন্যই জরুরি অবস্থা লাগু করা হয়। কিন্তু অর্থনৈতিক তত্ত্বের দিক থেকে কিছু প্রশ্ন থেকে যায়— যদি দেশে মন্দাবস্থা বজায় থাকে, তবে কীভাবে মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে, তা বোঝা মুশকিল, যেহেতু মন্দাবস্থায় চাহিদা কমে যাবে, সুতরাং কমবে মূল্যবৃদ্ধি। অশোক মিত্র এই প্রশ্নে ভারতের রাজনৈতিক-অর্থনীতির এক অসাধারণ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেন যে সেই সময়ে গ্রামীণ ভারতের জোতদার, জমিদার ও বড়ো চাষিরা সরকারের উপর তাদের শ্রেণিপ্রভাব বিস্তার করে, ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বাড়ানোর মাধ্যমে, শিল্পজাত পণ্যের তুলনায় কৃষি পণ্যের মূল্য বাড়াতে সক্ষম হন। মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বৃহদাংশ কৃষি পণ্য কিনতে ব্যয় হয়, শিল্পপণ্যের চাহিদা কমে এবং সেখানে মন্দা দেখা দেয়। আবার কৃষি পণ্যের দাম বাড়ার জন্য সামগ্রিকভাবে দেশে মূল্যবৃদ্ধির ভয়াবহ প্রকোপ সাধারণ মানুষের উপরে পড়তে শুরু করে। ভারতের অর্থব্যবস্থার সঠিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ কীভাবে করতে হয়, তা শিখতে হলে এই বই পড়া আবশ্যিক। আসলে Calcutta Diary ও Terms of Trade and Class Relations in India, একই সূত্রে বাঁধা। প্রথমটি সেই উথালপাথাল সময়ের দিনপঞ্জিকা ও জনগণের উপরে যেই অত্যাচার নামিয়ে আনা হয়েছিল, তার ধারাবিবরণী। আবার দ্বিতীয় বইটি সেই অত্যাচার কেন হয়েছিল, তার রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ। একই ব্যক্তির মধ্যে তত্ত্ব ও প্রয়োগের এহেন মিশ্রন, সাংবাদিক প্রাবন্ধিক ও অর্থনীতির তাত্ত্বিকের এরকম সহাবস্থানের নিদর্শন ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাসে বিরল।

কিন্তু অশোক মিত্রের বহুমুখী প্রতিভার এখানেই শেষ নয়। ইংরাজি ভাষায় লেখা তাঁর উপরোক্ত বিখ্যাত বইগুলি তাঁর লেখকপ্রতিভার একটি অংশ মাত্র। একইসঙ্গে তিনি বাংলা ভাষার একজন অগ্রগণ্য গদ্যকার। তরুণ বয়স থেকেই তাঁর বাংলা ভাষার একজন অগ্রগণ্য গদ্যকার। তরুণ বয়স থেকেই তাঁর লেখায় প্রতিভার বিচ্ছুরণ। স্বয়ং বুদ্ধদেব বসু যাঁকে গদ্যকার হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন, তিনিই আবার বাংলা কবিতার অত্যন্ত মনোযোগী পাঠক। বাংলা কবিতা, সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি নিয়ে তাঁর অজস্র প্রবন্ধ ও বই। 'কবিতা থেকে মিছিলে'র লেখক তিনি, যেই বই অগুনতি বাম কর্মীকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। 'তাল-বেতাল' গ্রন্থের জন্য ১৯৯৭ সালে সাহিত্য আকাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর স্মৃতিকথা 'আপিলা-চাপিলা'য় ফুটে উঠেছে এক আশ্চর্য জীবনের নানান কাহিনি যা আবার একইসঙ্গে বিংশ শতাব্দীর পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাসের দলিল। জীবনের প্রায় শেষদিন অবধি 'আরেক রকম'-এর জন্য 'স্মৃতি-বিস্মৃতি' কলাম লিখেছেন, তার আগে 'অমিত্রাক্ষর'। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লিখে গেছেন। এমনকী ক্রিকেট নিয়ে Telegraph পত্রিকায় তাঁর লেখা নিবন্ধগুলি পাঠকদের সমৃদ্ধ করেছে। Telegraph পত্রিকায় তাঁর কলাম Cutting Corners এবং First Person Singular, দুইই সংকলিত হয়েছে বিখ্যাত কিছু বইয়ে।

তবু শুধু অর্থনীতির তত্ত্ব নয়, শুধু কবিতা, সাহিত্যচর্চা নয়, শুধু প্রবন্ধ রচনা নয়, তাঁর জীবন পরিব্যাপ্ত হয়েছে

'কবিতা থেকে মিছিলে', কবিতার আবেগ, নান্দনিকতা থেকে মিছিলের প্রতিরোধে থেকেছেন তিনি। ১৯৭৭ সালের প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের অর্থমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন তিনি। প্রথম বামফ্রন্ট সরকারে পাঁচ বছর এবং দ্বিতীয় বাম সরকারে দুই বছরের বেশি এই দায়িত্ব যত্ন সহকারে পালন করেছেন। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে, ব্রিটিশ শাসনকাল থেকে, যুগ যুগ ধরে জমিদার জোতদারদের শোষণে নিষ্পেষিত হয়েছে কৃষক সমাজ। পশ্চিমবঙ্গের কৃষিতে বৃদ্ধির হার প্রায় শূন্য, যেখানে অধিকাংশ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। তাই গ্রামীণ বাংলায় প্রবল দারিদ্র্য। ক্ষমতায় আসার পরে, বামফ্রন্ট সরকারের তরফ থেকে তিনটি প্রগতিশীল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, যেখানে অর্থমন্ত্রী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন অশোক মিত্র। প্রথমত, অপারেশন বর্গা ও ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে ভূমিহীন কৃষকদের হাতে তুলে দেওয়া হয় জমি। 'লাঙল যার, জমি তার' নীতির সফল প্রয়োগ ঘটে পশ্চিমবঙ্গে। দ্বিতীয়ত, ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রান্তিক মানুষের ক্ষমতায়ন করা হয়। যাকে মডেল হিসেবে মেনে নিয়ে পরবর্তীকালে রাজীব গান্ধীর কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধান সংশোধন করে সমস্ত রাজ্যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গড়ে তোলার আইন প্রণয়ন করে। তৃতীয়ত, অর্থমন্ত্রী হিসেবে গ্রামীণ ও কৃষিক্ষেত্রে অধিক সরকারি বিনিয়োগের পথে হাঁটেন অশোক মিত্র। এই ত্রিমুখী নীতির দরুণ, কৃষি ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার দেশের সমস্ত রাজ্যের মধ্যে সর্বাধিক হয়। বামফ্রন্ট সরকারের তিন দশকের বেশি সময় পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচিত হওয়ার নেপথ্যে রয়েছে এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ, যা গোটা পৃথিবীতে সমাদৃত।

অর্থমন্ত্রী হিসেবে অশোক মিত্রের ভূমিকা এখানেই শেষ হয়ে যায় না। আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের অন্যতম প্রধান পুরুষ তিনি। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পরে একের পর এক চিটফাণ্ড কেলেঙ্কারি ঘটেছে। সাধারণ মানুষের টাকা আত্মসাৎ করেছে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী যাদের যোগ্য সঙ্গত দিয়েছে শাসকদলের নেতা-মন্ত্রীরা। কিন্তু অশোক মিত্র যখন অর্থমন্ত্রী, সেইসময় চিট ফান্ডগুলির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিয়ে সাধারণ জনগণের গচ্ছিত অর্থকে সুরক্ষিত করেছিলেন তিনি। এতে মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও ব্যবসায়ীদের অত্যন্ত বিরাগভাজন হয়েছিলেন। তবু, অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষার প্রশ্নে কোনো আপোশ করেননি তিনি।

সেইসময়, অশোক মিত্র প্রথম অর্থনীতিবিদ এবং অর্থমন্ত্রী যিনি কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস নিয়ে সরব হন। জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে সমস্ত অ-কংগ্রেস সরকারগুলিকে একত্রিত করে কেন্দ্রের উপর চাপ বাড়ানো হয় বেশি পরিমাণে আর্থিক সম্পদ ও দায়দায়িত্ব রাজ্য সরকারগুলির হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। এই চাপের মুখে কেন্দ্র সারকারিয়া কমিশন গঠন করে, যা কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক সম্পর্কের পুনর্বিন্যাসের পক্ষে সুপারিশ করে। অশোক মিত্র ছিলেন এই গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনের মূল তাত্ত্বিক ও অন্যতম শীর্ষ সংগঠক। জিএসটি লাগু হওয়ার জন্য কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক সম্পর্কে কেন্দ্রের পাল্লা ভারী হয়েছে বলে মনে করতেন তিনি। কয়েক মাস আগেও, 'আরেক রকম'-এর পাতায় ও অন্যত্র, কেন্দ্রের এই নীতির বিরুদ্ধে এবং ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় রাজ্যের অধিক ক্ষমতার দাবিতে কলম ধরেন, একের পর এক মন্তব্য করেন অশোক মিত্র। এমনকী, জিএসটি আইনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে দ্বারস্থ হওয়া যায় কিনা, তাও বিভিন্ন অর্থনীতিবিদদের কাছে প্রস্তাব করেন তিনি।

বামফ্রন্ট সরকারের শুরুর এক দশকের গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত উদ্যোগে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা থাকলেও, দল ও সরকারের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের সঙ্গে কিছু নীতির প্রশ্নে তাঁর মতানৈক্য দেখা দেয়। যখন তিনি বোঝেন যে তাঁর বিশ্বাস ও আদর্শের প্রতি অবিচল থেকে অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়, তখন তিনি দল এবং সরকার থেকে পদত্যাগ করেন। আবারও প্রমাণ করেন যে, ব্যক্তি স্বার্থ নয়, নীতির জন্য আদর্শের জন্য রাজনীতিতে ছিলেন তিনি। সেই নীতি এবং আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে পদ আঁকড়ে পড়ে থাকতে তাঁর ঘোর আপত্তি। কিন্তু তাই বলে বামপন্থার পথ থেকে কখনো সরে আসেননি অশোক মিত্র। পার্টি নব্বইয়ের দশকে তাঁকে রাজ্যসভার সাংসদের দায়িত্ব পালন করতে বলে, যেখানে তিনি মনমোহন সিংহ প্রণোদিত নয়া আর্থিক নীতি, বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন, সরকারকে কঠিন প্রশ্নের মুখে ফেলতে থাকেন, গরিব খেটে খাওয়া মানুষের কথা সংসদের ভিতরে তুলে ধরেন। আবার নব-উদারবাদী নীতির বিরুদ্ধে, শ্রমিক শ্রেণির উপর বিশ্বায়নের ভয়ানক প্রভাবের বিরুদ্ধে লাগাতার লিখতে থাকেন তিনি, জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করেন কর্পোরেট বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে।

তবু, বিশ্বায়নের বাতাসে বামপন্থীদের নীতি ও আদর্শও দোদুল্যমান। পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে বামফ্রন্ট

সরকারের শীর্ষে যাঁরা, তারা মনে করলেন যে কর্পোরেট পুঁজির হাত ধরে, জোর করে জমি অধিগ্রহণ করে শিল্পায়ন না করলেই নয়। শিল্পায়নের বিকল্প পথ নিয়ে ভাবতে, গণতান্ত্রিকভাবে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কৃষকদের সম্মতি নিয়ে জমি-অধিগ্রহণের দিকে হাঁটতে বাম সরকার রাজি হয়নি। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামকে ঘিরে গোটা রাজ্য রাজনীতি তোলপাড়, বামেদের সমর্থনে প্রবল ধস। অশোক মিত্র, বাম বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সেই বিরল ভূমিকা পালন করেছেন, যেখানে পার্টি বা সরকারের প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্যের থেকে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে বাম মতাদর্শ ও সত্য কথার প্রতি অবিচল আস্থা। তাই, ২০০৬ সালের বিপুল জয়ের পরেও, অশোক মিত্র বামেদের সতর্ক করেছেন, তাদের বামনীতির প্রতি অবিচল থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয়নি। পার্টি একের পর এক ভুল করেছে, অশোক মিত্র বিভিন্ন নিবন্ধের মাধ্যমে সেই ভুলগুলি ধরিয়ে দিয়েছেন, সমালোচনা করেছেন, যেই পার্টিকে প্রবলভাবে ভালোবেসেছেন, তার উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'তুমি আর নেই সে তুমি', নেতাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন, 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না'। কিন্তু সমস্ত উপদেশ, পরামর্শ, সর্বজ্ঞ অথচ জনবিচ্ছিন্ন, পার্টি নেতারা উপেক্ষা করেছেন, তাঁদের নির্বাচিত পথ থেকে তাঁরা একচুলও সরেননি। ফল, যা হওয়ার হয়েছে, রাজ্যে ক্ষমতা হারিয়ে তারা বিধানসভায় বর্তমানে তৃতীয় শক্তিতে পরিণত হয়েছেন। তবু, বলতেই হয়, শত সমালোচনার পরেও, অশোক মিত্র বামফ্রন্টের প্রতি দায়িত্ব পালন করেছেন, একদিকে, কংগ্রেসের সঙ্গে বামেদের জোটের সমালোচনা করেছেন আবার ২০১৬ সালের নির্বাচনে ঘোষণা করে, নিবন্ধ লিখে তাদেরকে ভোটও দিয়েছেন।

আজ তিনি আমাদের মধ্যে নেই। তবু, 'আরেক রকম' পত্রিকার প্রতি তাঁর যে প্রেম, যে দায়বদ্ধতা, তা আগামী দিনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমাদের নিতে হবে। আমরা জানি এটি অত্যন্ত কঠিন দায়িত্ব, অশোক মিত্রের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, তাঁর ভাবনাচিন্তার গভীরতাকে প্রতিপদে সম্মান জানিয়ে, পত্রিকার মান তাঁর স্তরে বজায় রেখে এগিয়ে যাওয়া সহজ হবে না। কিন্তু, তিনিই আমাদের শিখিয়েছেন, শত প্রতিকূলতার মধ্যেও, সত্যের পথে, ন্যায়ের পথে, বামপন্থার পথে স্থিতধী থাকা যায়, থাকতে হয়। সেই প্রত্যয় নিয়েই 'আরেক রকম' এগোবে। এবং যেহেতু তাঁর 'চেতনা জুড়ে মার্কসীয় প্রজ্ঞার প্লাবিত বিভাস', তাই মার্কসের ভাষা ধার করেই আমাদের অঙ্গীকার 'আরেক রকম'-এর লক্ষ্য আগামী দিনে একটাই, বাম প্রগতিশীল আদর্শের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে, 'ruthless criticism of all that exists'।

বিজ্ঞপ্তি

'আরেক রকম'-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক অশোক মিত্রের স্মৃতিতে আমরা বহু নিবন্ধ পেয়েছি, পাচ্ছি। এই সংখ্যায় তার থেকে বাছাই করে কিছু প্রবন্ধ আমরা ছেপেছি। আগামী সংখ্যাতেও আমরা অশোক মিত্রের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে তাঁকে নিয়ে আরো লেখা ছাপব।

[প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক অশোক মিত্র, 'আরেক রকম'-এর প্রথম সংখ্যায় এই পত্রিকার উদ্দেশ্য নিয়ে একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন, যা আমরা পুনর্মুদ্রিত করলাম। আজ, যখন তিনি নেই, কিন্তু 'আরেক রকম'-কে এগিয়ে যেতে হবে, তখন তাঁর তৈরি করে দেওয়া রূপরেখার প্রতি সৎ থাকতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।]

আরেক রকম

এটাই তো আরেক রকম। পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীতে যে-ক'জন আছি, আমাদের অতীত তথা বর্তমান চারণভূমি আলাদা, অভিজ্ঞতাও বিভিন্ন ধরনের, অনেক বিষয়েই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেও তাই কম-বেশি এদিক-ওদিক। অথচ একটি ক্ষেত্রে আমরা প্রবল সহমত পোষণ করি। একটি বিশেষ প্রশ্ন আমাদের সবাইকে সম্প্রতি কুরে-কুরে খাচ্ছে : কোন্ অগ্রগামী অধঃপাতের দিকে আমাদের দেশ-সমাজ-সংস্কৃতি ঊর্ধ্বশ্বাসে এগিয়ে চলেছে, পরিবেশের কেন এমন নোংরা চেহারা, রাজনীতির প্রাঙ্গণে কেন এত চরিত্রহীনতা, অর্থব্যবস্থায় কেন এত অশ্লীল বৈষম্য তথা অসামঞ্জস্য, সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে রুচি কেন ক্রমশ বিকৃত থেকে বিকৃততর, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-পরিবহন ব্যবস্থায় নৈরাজ্য কেন নিয়মে পরিণত, সমাজচেতনাকে কেন্দ্রবিন্দু করে একদা যে-মূল্যবোধ প্রায় সর্বজনগ্রাহ্য স্বীকৃতি পেয়েছিল, তা এখন কেন প্রত্যাখ্যাত? বিশ্বায়নজড়িত পরিব্যাপ্ত অর্থগৃধ্নুতার ঘাড়েই এই সার্বিক রূপান্তরের দায় চাপানো সংগত হবে কিনা হয়তো তা নিয়ে আমাদের মধ্যে মতান্তর আছে, কিন্তু মলিন দিনগুলি একটু-একটু করে যে মলিনতর হচ্ছে, চারপাশে আবর্জনার জঞ্জাল যে আরো-আরো স্তূপীকৃত হচ্ছে, তা নিয়ে তো কোনো সংশয় নেই।

অন্য যে বিষয়ে আমাদের মধ্যে নিবিড় মতৈক্য, সার্বিক অধোগমনের প্রবণতাকে ললাটলিখন বলে মেনে নিয়ে হাত-পা গুটিয়ে মহাপ্রলয়ের বিশেষ মুহূর্তটির জন্য প্রতীক্ষায় থাকা মহাপাতকের সমার্থক, প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ার দায়িত্ব আমাদেরই বহন করতে হবে, যে যেখানে অবস্থান করছি আমাদের প্রত্যেককে। আমাদের উপর গোটা ভুবনের ভার বাইরে থেকে কেউ চাপিয়ে দেবে না, কারও সেই মাথাব্যথা নেই, আমাদেরই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মঞ্চে অবতীর্ণ হতে হবে। সামনের দিকে কী আছে তা আমাদের জানা নেই, কী আর করা, এ ধরনের নেতিবাচক উচ্চারণে বিরত থেকে আমরা যেন বিকল্প উচ্চারণ করি : সামনের দিকে কীসের অবস্থান তা নির্ভর করছে আমাদের আচরণ-বিচরণ-সিদ্ধান্তের উপর। হতভম্ব উদ্রেককারী পরিস্থিতি। তাহলেও আমাদের প্রতীতি, ইতিহাসের এখানেই ইতি ঘটছে না, আগামী দিনে ইতিহাস কোন্ দিকে ঘুরবে তার নিয়ামক হতে পারি আমরাই।

ব্যক্তিগত বিশ্বাসের কথাই বলি। অসাম্যে পরিকীর্ণ অর্থব্যবস্থা, নানা জাতপাত-ভিত্তিক দ্বন্দ্ব, সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি, পরিকীর্ণ আঞ্চলিক আচরিক বিভেদ— এ সমস্ত কিছু সত্ত্বেও গোটা দেশ জুড়ে চক্ষুলজ্জা-মেশানো একটি সামগ্রিক অনুশাসন মোটামুটি, অন্তত বিংশ শতাব্দীর উপান্ত পর্যন্ত, মেনে চলা হতো : যত কদাচারেই মত্ত হও, লক্ষ্মণরেখাটি অতিক্রম করতে নেই, সাধারণ মানুষজন, অর্থাৎ সমাজব্যবস্থা, সে-ধরনের অনাচার মেনে নেবে না। যতই অন্তর্লীন দ্বন্দ্বে বিধ্বস্ত হোক আমাদের পরিবৃত্ত, কিছু-কিছু নিয়ম-নীতির নিয়ন্ত্রক যে-অদৃশ্য সমাজ, তার সম্পর্কে খানিকটা শ্রদ্ধা-মেশানো ভয়, নয় তো ভয়-মেশানো শ্রদ্ধা। সেই সঙ্গে, স্বাধীনতা আন্দোলনের ভাবাদর্শের ঐতিহ্য হিশেবেই হয় তো, রাষ্ট্রকে নিয়েও ঈষৎ আস্থাজ্ঞাপক মানসিকতা : রাষ্ট্র সমাজের প্রতিভূ, সংবিধানের নির্দেশবলে সার্বিক সামাজিক উন্নয়নের দায়-দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর অর্পিত। একটা সময়ে রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীলতা এত স্বতঃসিদ্ধ বলে বিবেচিত হয়েছিল যে সংবিধান সংশোধন করে ভারতবর্ষকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করা হলো পর্যন্ত, আর্থিক ও সামাজিক মুক্তির দিশা দেখাবে রাষ্ট্র, এটাই যেন শেষ কথা।

ঝটপট অনেকগুলি বছর গড়িয়ে যাওয়ার পর ইতিহাসের নতুন অধ্যায়। একই রাজনৈতিক দল এই দীর্ঘ সময় জুড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অধিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও উলট পুরাণ। নতুন একটি আর্থিক দর্শনের ঢেউ এসে ধ্যান-ধারণা পাল্টে দেওয়ার লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লো। সমাজের প্রতি নিছক অন্যমনস্কতা নয়, অশ্রদ্ধা তথা অবজ্ঞা পোষণ : মানুষের উপর ছড়ি ঘোরাবার কোনো অধিকার সমাজের নেই, মানুষ স্বয়ম্ভূ, নিজের ইচ্ছায় সে নিজেকে চালনা করবে, সমাজ এবং রাষ্ট্রের নাক গলানো চলবে না। ব্যক্তিমানুষের উচিত সর্বদা নিজের স্বার্থ চিন্তা করা, জীবনে কী উপায়ে কতটা একমাত্র নিজের উন্নতি ঘটানো যায় সেই সাধনায় মগ্ন থাকাই তার নিজের কর্তব্য। লক্ষ্মীছাড়া রাষ্ট্র যেন বাধা দিতে না আসে। প্রত্যেকেই যদি নিজেরটা নিয়ে ভাবে, নিজের-নিজের চরকায় তেল দেয়, তা হলেই নাকি গোটা

দেশ এগিয়ে যাবে। রাষ্ট্র শুধু প্রতিরক্ষা ও অভ্যন্তরীণ আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে থাকবে। আর্থিক পরিকাঠামো সুগঠনের ভার গ্রহণ করবে, খবরদার, তার বাইরে হাত বাড়াবে না, কৃষি-শিল্পের দিকে কুনজর দেবে না, ব্যক্তিমানুষ কৃষি-শিল্পে-ব্যবসা-বাণিজ্যে বাধাবন্ধহীন, পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে, দক্ষতায় একে অপরকে হারিয়ে দিয়ে বাজার দখল করার চেষ্টা করবে। যে সফল হবে বাজার যাকে বিজয়ী বীর বলে ঘোষণা করবে, সে লাভের পাহাড়ের উপর চড়ে বসবে, প্রতিযোগিতায় যারা পরাজিত হলো, তাদের দিকে ফিরে তাকাবার দরকার নেই।

এই নিদারুণ জীবনদর্শনে সমাজকে গত দুই দশক ধরে বিপর্যস্ত করেছে। এমনিতেই যে-সমাজ গভীর অসাম্যের শিকার ছিল, যে-করেই-হোক-লাভ-করো, অর্থগৃধ্নুতা আদৌ-দূষণীয়-নয় বরঞ্চ-আত্মোন্নতির-আকর ইত্যাকার বরাভয় সামাজিক মূল্যবোধকে ক্রমশ চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছে। যে করেই হোক মুনাফা করতে হবে, চুরি-ডাকাতি করে হলেও কিছু যায় আসে না : প্রশাসনের শীর্ষে যাঁরা আছেন, তাঁরাই প্রতিদিন তা প্রমাণ করে যাচ্ছেন, চোখের চামড়াটি পর্যন্ত খসে পড়েছে। সমষ্টি ব্যক্তির শত্রু, রাষ্ট্র যেহেতু সমষ্টির প্রতিনিধিত্ব করে, রাষ্ট্রব্যবস্থাকে দুর্বল করতে না পারলে সাধারণ নাগরিকের পক্ষে স্বাধীনভাবে আচরণ বিচরণ তথা জরুরি সিদ্ধান্তগ্রহণ সম্ভব নয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে যে-সব রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প স্থাপিত হয়েছে, সে-সব জলের দরে বিকিয়ে দেওয়াই যেন অতএব বিধেয়। তেল-গ্যাস-কয়লা-দস্তা গোছের জাতীয় সম্পদও অতি ত্বরায় বে-সরকারি মালিকদের কাছে বেচে দেওয়া মন্ত্রী-আমলাদের এই ধরনের ফরমানই যেন আপাতত তাঁদের প্রধান কর্তব্য। পরম উপকৃত কৃতজ্ঞ মালিকপক্ষ যদি কৃতজ্ঞতার স্মারক হিসেবে কিছু উপঢৌকন অর্পণ করেন, তাকে উৎকোচ বলে বর্ণনা আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। কোটি কোটি বেকার, কৃষিক্ষেত্রে দিনমজুর-ভাগচাষি-ছোট কৃষককুল ধুঁকছেন, তাতে সরকারের তেমন মাথাব্যথা নেই। যেহেতু নবআর্থিক বিধানহেতু শিল্প-বাণিজ্যের উপর সমস্ত নিগড় তুলে নেওয়া হয়েছে, বিদেশ থেকে অঢেল সামগ্রীর আমদানি, প্রতিযোগিতায় টিকে থাকবার তাগিদে অনেক ক্ষেত্রে দ্রুত আধুনিকীকরণ, কর্মসংকোচন ঘটছে, অথচ সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ করতে গেলে ছাঁটাইয়ের হুমকি। বিদেশী বাণিজ্যগোষ্ঠী প্রত্যুদ্‌গমন করে নিয়ে আসা হচ্ছে, বিদেশীরা আসছেন তাঁদের স্বার্থ প্রসারিত করতে, এদেশের মানুষের শুভ-অশুভ দেখায় দায় তাঁদের নেই। বিদেশী আক্রমণের জুজু দেখিয়ে প্রতি বছর হাজার-হাজার লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ হচ্ছে, অনুরূপ বরাদ্দ হচ্ছে পারমাণবিক অস্ত্রসম্ভার বৃদ্ধির বেচাল নেশায়। বিদেশ থেকে অঢেল অস্ত্র আমদানি ক্রমবর্ধমান, অথচ এই হাজার-লক্ষ কোটি টাকা থেকে কে কত টাকা নিজের ট্যাঁকে গুঁজছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে গেলেই দেশদ্রোহী সম্ভাষণে ভূষিত হবার ঝুঁকি, আরো হাজার-হাজার কোটি টাকা প্রতি বছর উগ্রপন্থী দমনের নামে ব্যয়িত হচ্ছে যার বিশদ বিবরণ দাখিল করার দায় সরকারের নেই। অথচ সর্বজনীন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ-ব্যবস্থা মারফৎ দরিদ্রতম মানুষজনদের নিয়মিত সামান্য কিছু খাদ্যশস্য সস্তায় পৌঁছে দেওয়ার প্রস্তাবে সরকারের গভীর অনীহা। তত্ত্বকথা তৈরি : ভরতুকি দিয়ে খাদ্যশস্য বিতরণ করলে পুঁজিপতি ব্যবসায়ীদের মন খারাপ হবে, বাজারি প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করা হবে, তা নাকি ঘোর পাপ, সরকারের বিবেক কাঁপে। তবে স্বাধীন ভারতবর্ষের কোনো হতচ্ছাড়া নাগরিকের মৃত্যু ঘটলে সরকারের বিবেক অকম্পিত। বিদেশী সংস্থাগুলি নির্বিচারে বাজারে ওষুধের দাম যদি বাড়িয়ে বাড়িয়ে যায়, সে-ক্ষেত্রেও সরকারের বিবেক অনড়, বাজারি প্রক্রিয়ায় তো হস্তক্ষেপ করা যায় না, তেমনটা করতে গেলে বিদেশী বন্ধুরা অসন্তুষ্ট হবেন, তাঁরা গোঁসা করলে বিদেশী বিনিয়োগের পরিমাণ হ্রাস পাবে, দেশ বিপন্ন হবে।

গত কুড়ি-পঁচিশ বছরের বিদেশী বিনিয়োগমোহ তথা 'মুক্ত' অর্থনীতির প্রকোপে দেশের শতকরা আশি-পঁচাশি ভাগ মানুষের দুর্ভোগ বেড়েছে বই কমেনি, আখের গুছিয়েছেন উপরতলার মহান নাগরিকবৃন্দ। এ এক অলজ্জ সামাজিক ব্যবস্থা, কিন্তু বলা হবে মুক্ত অর্থনীতির যেহেতু এটাই পরিণাম, শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নিতে হবে, গরিবদের আপাতত একটু অসুবিধা হচ্ছে হয়তো, তবে চিন্তার কারণ নেই, বড়োলোকদের হাতে তো এখন অনেক টাকা, তাঁরা খরচাপাতি করবেন, বিক্রি-বাটা বাড়বে, গরিবদের তাতে সুবিধা হবে।

অভিজ্ঞতা তা বলে না। গরিবদের আদৌ সুবিধা হয়নি, হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। কর্তাব্যক্তি সম্প্রদায় তবুও অনড়। উদারীকরণের ফলে অর্থব্যবস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম, অবস্থার মোড় ফেরাতে নাকি আরো উদার করতে হবে অর্থব্যবস্থাকে নইলে উপায় নেই। আমাদের চোখে অনন্তকালের জন্য ঠুলি পরিয়ে রাখার চেষ্টা চলছে, বিভ্রান্তি অনেক দূর ছড়িয়েছে। এমনকী অনেক আদর্শবাদী বামপন্থী পর্যন্ত আত্মবিশ্বাস ক্ষুইয়ে বসতে চলেছেন। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিতে বিভিন্ন গোত্রের ভেকধারীরা আসরে নেমেছেন। তাঁরা জমির লেন-দেনে রাষ্ট্রকে নাক

গলাতে না দিতে দৃঢ়বদ্ধ। সরকারি অধিগ্রহণে তাঁদের প্রচার অনুযায়ী কৃষকদের স্বার্থ ব্যাহত হয়। তাঁদের এই অবস্থানের ফলে অসহায় গ্রামবাসী শোষণকারী দালাল ও পুঁজিপতিদের কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। যাঁরা খুচরো ব্যবসায় বিদেশীদের ঢুকতে না দিতে বদ্ধপরিকর, তাঁরা গরিব খেটে-খাওয়া মানুষদের স্বার্থ নাকি কিছুতেই বিপন্ন হতে দেবেন না, তাঁরাই অথচ দরিদ্র শ্রমজীবীদের ধর্মঘটের অধিকার কেড়ে নিতে সমান অঙ্গীকারবদ্ধ।

এটা এই মুহূর্তে হট্টমালার দেশ, যাঁদের গলার দাপট বেশি, তাঁদের কথাই সবচেয়ে বেশি কর্ণগোচর হচ্ছে, খবরকাগজে-বেতারে-দূরদর্শনে তাঁরা সমস্ত জায়গা জুড়ে বিরাজ করছেন। একই ধরনের যুক্তি-অযুক্তি-কুযুক্তি, একই ধরনের আস্ফালন, তত্ত্ববিস্তার, একই গোছের তথ্য পরিবেশন। চোরের মায়ের গলা উচ্চনাদতম। চোরের মায়েরা এই মুহূর্তে সমাজের সর্বত্র সাম্রাজ্য বিস্তার করেছেন, অভিনয় মঞ্চ থেকে খেলার মাঠ, রাজনীতি থেকে শিক্ষাপ্রাঙ্গণ, শিল্পচর্চা থেকে সাহিত্যবিচার, সর্বত্র একই রকম রঙ্গ-বিভঙ্গ।

অস্বস্তি হয় : কোনো-কোনো মুহূর্তে বিবমিষাবোধ পর্যন্ত। সব কিছু মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। প্রথাগত চর্চা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে একটু আলাদা ধরনের কথোপকথন কি সম্ভব নয়? একটু পরীক্ষা করেই দেখা যাক না কেন। আমরা একটি বিনম্র মঞ্চের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, যাঁর যেরকম ইচ্ছা করবে জাগতিক যে-কোনো সমস্যা নিয়ে স্ব-স্ব মতামত ব্যক্ত করুন, তর্ক জমুক, চর্চা চলুক। চর্বিতচর্বণ নয়, পরিচিত অভ্যাসমালার রকমফের নয়, অন্য রকম, পুরোপুরি আরেক রকম।

অশোক মিত্র

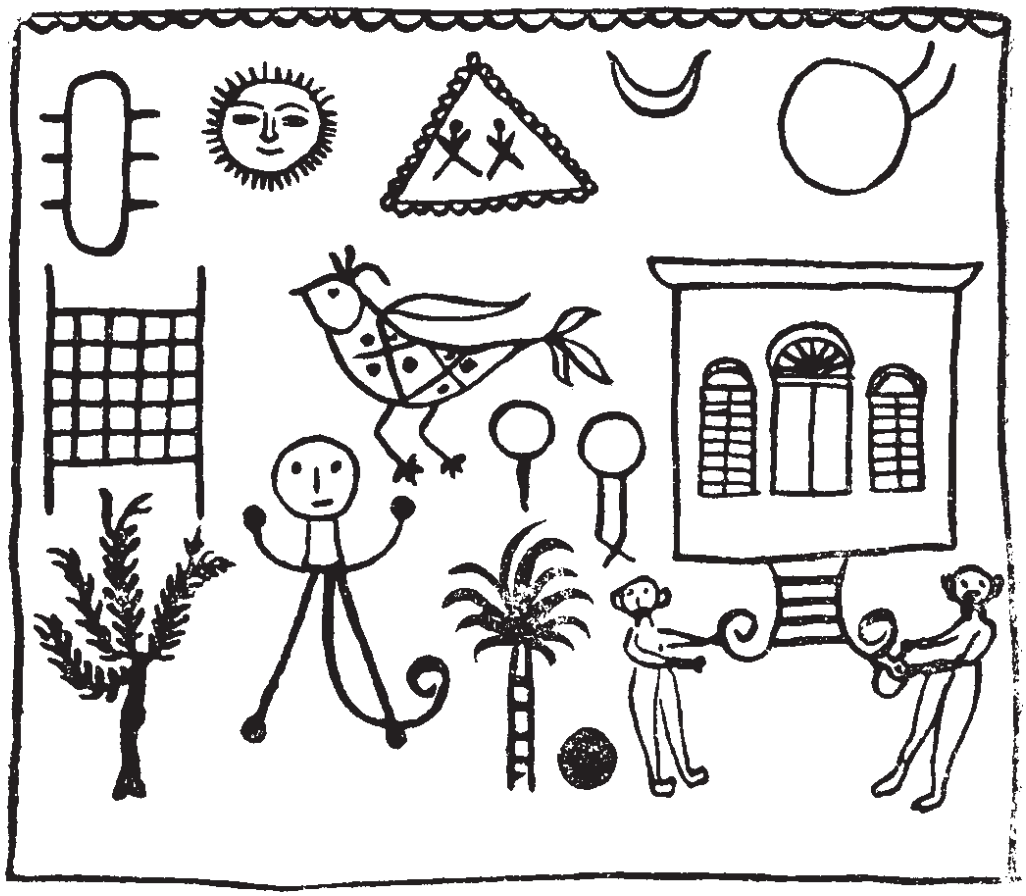

আমাদের অশোকদা

অমিয়কুমার বাগচী

এই নিবন্ধের প্রথম অংশে থাকবে অশোক মিত্রের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত আলাপ-পরিচয়ের কথা। যতদূর মনে পড়ে অশোক মিত্রের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় যখন আমি কেমব্রিজে পিএইচ.ডি করছি সে-সময়। উনি অমর্ত্য সেনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তারপর যশোধরার (রত্না) সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়, উনি নিজেই তার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছিলেন। অশোক মিত্র আমার কাছে অশোকদা হয়ে উঠলেন যখন আমি কেমব্রিজের পড়াশোনা শেষ করে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াতে আরম্ভ করলাম। উনি তখন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্টে পড়াচ্ছেন আর সমর সেনকে হুমায়ুন কবীর প্রতিষ্ঠিত 'নাউ' কাগজের সম্পাদনায় সহায়তা করছেন। আমার উপরে ভার পড়ল সেই কাগজের জন্যে প্রতি মাসে একটি কলাম লেখার। নির্দিষ্ট দিনে উনি আমাদের বাড়িতে এসে লেখা নিয়ে যান। হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় নতুন ব্যবস্থাপনায় ও সমরবাবুর সম্পাদনায় 'নাউ' যখন আবার প্রকাশিত হতে থাকল তখনও আমার এই কাজ করে যেতে হল। জীবনে সেই প্রথম এবং শেষ আমার সাংবাদিকতা করা। এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে যখন কমিউনিস্ট পার্টি দু-ভাগ হয়ে সিপিআই এবং সিপিআই(এম) হল তখন অশোকদা আর সমরবাবুর মতো আমিও সিপিআই(এম)-এর সমর্থক হলাম, যদিও এক সিপিজিবি-এর ছাত্র ফ্রন্টের মিটিং-এ নিয়মিতভাবে যোগ দেওয়া ছাড়া কোনো রাজনৈতিক দলে যোগ দিইনি।

আমি ১৯৬৫ সালে কেমব্রিজে পড়াতে যাই এবং ১৯৬৯-এর জানুয়ারি মাসে কলকাতায় ফিরে আসি। ততদিনে নকশালবাড়ি আন্দোলনে সারা রাজ্য এবং সারা দেশের অনেক অংশ উত্তাল হয়ে উঠেছে। প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যেখানে যশোধরা তখন অধ্যাপনারত— দু-জায়গাতেই প্রচুর নকশালপন্থী ছাত্র এসে গিয়েছে। আমার প্রত্যক্ষ ছাত্রদের মধ্যে অসীম চ্যাটার্জি এবং অনির্বাণ বিশ্বাস সেই আন্দোলনে যোগ দিয়েছে এবং তার জন্যে কারাদণ্ড ভোগ করেছে। সমরবাবু ততদিনে 'নাউ' ছেড়ে দিয়ে 'ফ্রন্টিয়ার' পত্রিকা বের করছেন। তখন অশোকদার সঙ্গে সমরবাবুর প্রচণ্ড মতবিরোধ চলছে। সিপিআই(এম)-এর অন্য সমর্থকদের মতোই তিনি মনে করতেন নকশালপন্থা একটা বিভ্রান্তকারী মতবাদ, লেনিনের ভাষায় বালকসুলভ বিচ্যুতি যার মাশুল বামপন্থী আন্দোলনকেই দিতে হবে।

অশোকদার ধারণা ছিল যে সমরবাবু নকশালপন্থীদের সমর্থক। সমরবাবুর মত কিন্তু তা ছিল না। নকশালদের বিরুদ্ধে সরকার, পুলিশ, সংবাদমাধ্যম সবাই খড়্গহস্ত। তাদের অনেক সময়ে বিনাবিচারে জেলে পুরছে, তাদের উপর অত্যাচার করছে, নির্বিচারে খুন করছে। অথচ বেশ কয়েক হাজার তরুণ-তরুণী সত্যিকারের দেশোদ্ধারের জন্যে লড়ছে। তাদের কথা বলবার কোনো সংবাদমাধ্যম নেই। সমরবাবু সেই মাধ্যমের জোগান দিচ্ছেন কম দামে যাতে তাঁর কাগজ সস্তায় কিনতে পারে। লুইস নামে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের তখনকার ম্যানেজার (যাঁর স্ত্রী প্যামেলা লুইস নকশালপন্থী হয়ে জেলে গিয়েছিলেন এবং সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে বই-ও লিখেছিলেন) সমরবাবুকে ফ্রন্টিয়ারের দাম একটু বাড়াতে বলেছিলেন, যাতে তিনি প্রেসের বড়োকর্তাদের কাছে ফ্রন্টিয়ারকে বিজ্ঞাপন দেওয়ার যুক্তি খাড়া করতে পারেন, কিন্তু সমরবাবু সে প্রস্তাবে রাজি হননি। সমরবাবু ফ্রন্টিয়ারে এমন লেখাও ছাপতেন যেখানে তাঁকে শ্রেণিশত্রু, পুঁজিবাদী ও জমিদারদের দালাল বলা হয়েছে, সুতরাং তিনি চারু মজুমদারের খতম অভিযানের নিশানায় পড়তেও পারেন। আমরা সন্ত্রস্ত থাকতাম কবে সমরবাবুকে কংগ্রেসি গুন্ডারা অথবা পুলিশ অথবা নকশালরা তাঁকে খুন করে বসে।

স্বভাবতই আমি ফ্রন্টিয়ারের নিয়মিত লেখক হওয়াতে অশোকদা রীতিমতো ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, যদিও আমি কোনোদিন নকশালপন্থার সমর্থনে কোনো লেখা লিখিনি। আমার মত ছিল যে ভারত সাধারণতন্ত্রের গণতন্ত্রী বাতাবরণে বিনা অপরাধে বা বিনা বিচারে যদি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উপর রাষ্ট্র অত্যাচার

করে আমাদের কর্তব্য যতদূর সাধ্য তাদের পক্ষে লড়া। অশোকদার সঙ্গে আমার সেই প্রথম এবং শেষ মতান্তর। এই মতান্তর সম্পূর্ণ দূরীভূত হল যখন সিদ্ধার্থ রায়ের জমানায় ব্রিটিশ আমলের মতো ভয়াবহ সন্ত্রাস নেমে এল। অশোকদা তখন ইকনমিক অ্যান্ড পোলিটিক্যাল উইকলিতে এ.ম. (AM) নামে নিয়মিত ক্যালকাটা ডায়েরি লিখে যাচ্ছেন এবং অন্য অনেক মন্তব্যের সঙ্গে সেই সন্ত্রাসের চেহারা তুলে ধরছেন। ১৯৭৪ সালে মহারাষ্ট্রের লোনাভ্লাতে ভি.এম. ডাণ্ডেকার (যিনি ভারতের দারিদ্র্য-পরিমাপকদের একজন পথিকৃৎ) একটা সেমিনার আয়োজন করেছিলেন। কলকাতা থেকে আমি, অশোকদা, বিহার থেকে প্রধান হরিশঙ্কর প্রসাদ সেখানে গিয়েছিলাম। ডাণ্ডেকার এবং এম.এল দাঁতওয়ালা বিশ্বাসই করলেন না যে, পশ্চিমবাংলায় এরকম সন্ত্রাস চলছে। সেখানে অশোক পার্থসারথি (জি. পার্থসারথির ছেলে) ইন্দিরা গান্ধীর মতিগতির একটা আন্দাজ দিয়েছিল এই বলে যে, প্রচুর প্যারামিলিটারি ফোর্স রিক্রুট করা হচ্ছে। তার পরেই ১৯৭৫ সালের জুন মাসের সিদ্ধার্থ রায়ের পরামর্শে ইন্দিরা গান্ধী এমার্জেন্সি ঘোষণা করলেন। তার ফলে বিনা বিচারে জেল আকছার চলতে থাকল। ফ্রন্টিয়ারের ২৬ জুন ১৯৭৫-এর সংখ্যা যেটাতে আমার সিনেমার ওপর একটা লেখা ছিল, সেটি নিষিদ্ধ হল। অশোকদা অকুতোভয়ে দেশে এবং বিদেশে Economist-এর মতো পত্রিকাতে এমার্জেন্সির বিরুদ্ধে লিখে চললেন।

১৯৭৬ সালে কেরালার সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজে আমার সঙ্গে ডাণ্ডেকারের আবার দেখা হল। তখন তিনি স্বীকার করলেন যে, ইন্দিরা গান্ধী সত্যিই দেশের উপর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নামিয়ে এনেছে, কারণ ইন্দিরা গান্ধী প্রচুর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের লোককেও জেলে পুরেছিলেন।

১৯৭৭ সালের মার্চ মাসে ইন্দিরা গান্ধী এমার্জেন্সির অবসান ঘটিয়ে নির্বাচন ঘোষণা করলেন। আমার আরো অনেক বন্ধুদের মতো অশোকদার নির্বাচনী প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। বামফ্রন্ট আশাতীত সংখ্যাধিক্য নিয়ে সেই নির্বাচনে জয়লাভ করল এবং জ্যোতি বসু অশোকদাকে অর্থমন্ত্রী মনোনীত করলেন। নকশালপন্থীদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে অশোকদা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। তার কিছু পরেই অশোকদা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'সবাই বলছে একটা স্টেট প্ল্যানিং বোর্ড নিয়োগ করা উচিত। তোমার মত কী?' আমি বললাম, 'আমার মতে তার কোনো দরকার নেই। সিদ্ধার্থ রায়ের আমলে দেখেছি অধ্যাপক দেবকুমার বসু ছাড়া বোর্ডের সভ্য হয়ে তাদের পায়াভারী হয়েছে, কাজের কাজ কিছু হয়নি, কারণ মন্ত্রীরা তাঁদের নিজের নিজের কনস্টিটুয়েন্সি আগলাতে ব্যস্ত থাকেন এবং আমলাদের পরামর্শে চলেন, প্ল্যানিং বোর্ডকে পাত্তা দেন না।' এই করে প্রায় এক বছর প্ল্যানিং বোর্ডকে ঠেকিয়ে রাখা গেল। কিন্তু তারপর অশোকদা জানালেন যে প্ল্যানিং কমিশন জেদ ধরেছে প্ল্যানিং বোর্ড করতেই হবে। তখন ঠিক হল যে তার নাম হবে প্ল্যানিং অ্যাডভাইসারি বোর্ড। অশোকদা জেদ ধরলেন যে আমাকে বোর্ডের মেম্বার হতেই হবে। যশোধরার এবং আমার দুজনেরই এতে আপত্তি ছিল, কিন্তু অশোকদার কথা ফেলতে পারি, আমাদের সাধ্য কী?

প্ল্যানিং বোর্ডের অভিজ্ঞতার কথা বলার আগে ফ্রন্টিয়ার এবং সমরবাবুর কথা বলে নিই। সমরবাবু যতদিন বেঁচে ছিলেন আমি নিয়মিতভাবে সেখানে লেখা দিয়ে গিয়েছি। অশোকদা সমরবাবুর সম্মানগ্রন্থ সম্পাদনা করলেন, Truth Unites বলে। তার বছর দেড়েক পরেই সমরবাবু প্রয়াত হলেন। তাঁর শেষ অসুখের সময় দেখভাল করেছিলেন অশোকদা এবং ডাক্তার কমল জালান।

প্ল্যানিং বোর্ডের প্রথম পুর্ণ সময়ের ভাইস চেয়ারম্যান হয়েছিলেন সত্যব্রত সেন। মহলানবিশের ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভের অন্যতম নির্মাতা। FAO-র লোভনীয় চাকরি ছেড়ে আসা সত্যব্রতবাবু সত্যিকারের বামপন্থী ছিলেন। যখন তিনি বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান, তখন অফিসের কাজ ছাড়া তিনি এবং তাঁর স্ত্রী মুক্তি সেন বাসে ঝুলতে ঝুলতে আসতেন। সত্যব্রতবাবুর পর ভাইস চেয়ারম্যান হয়ে এসেছিলেন ড. অরুণ ঘোষ, যিনি পরে প্ল্যানিং কমিশনের সভ্য হয়েছিলেন আর তারপর ভাইস চেয়ারম্যান হয়েছিলেন অধ্যাপক দেবকুমার বসু। প্রথম দুজনের সময়ে অনেক কাজ হয়েছিল। সংবিধানের সংশোধন করে রাজীব গান্ধীর জমানায় ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। তার অনেক আগেই ১৯৭৮ সাল থেকেই পশ্চিমবাংলায় সেই ধরনের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। তার উপকারিতা প্রমাণিত হয়েছিল ১৯৭৮-এর বিধ্বংসী বন্যার সময়। পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রামসংসদ, জেলাপরিষদের সভ্যদের তৎপরতায় বহু মানুষের প্রাণ, গবাদি পশু রক্ষা পেয়েছিল। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সুদৃঢ় হওয়াতে ভূমিসংস্কারেরও সুবিধা হয়েছিল। কার কত জমি সত্যিই আছে, কতটা বেনামিতে কতটা স্বনামে আছে কৃষকসভার সভ্যরা এবং পঞ্চায়েত সভ্যরা ঠিক জানতে পারতেন যার ফলে সিলিং-বহির্ভূত জমি সরকারি অধিকারে আনা গিয়েছিল। সারা দেশের মধ্যে পশ্চিমবাংলায় এইরকম জমি সবচেয়ে বেশি গরিব চাষিদের মধ্যে পুনর্বণ্টন করা সম্ভব হয়েছিল। তা ছাড়া সত্যিকারের ভাগচাষিকে চিহ্নিত করে অপারেশন বর্গাকে সার্থক করা গিয়েছিল। দেববাবু খুবই ভালো বামপন্থী ছিলেন, কিন্তু কাউকে কড়া কথা বলতে পারতেন না। একবার মনে আছে Commerce & Industries বিভাগের সংক্রান্ত প্ল্যানিং বোর্ডের মিটিং-এ আমাকে যেতে বললেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ওরা audited

accounts দিয়েছে?' উনি বললেন, 'না'। আমি বললাম, 'তাহলে মিটিং করে লাভ কী? ওরা বলবে, আরো কয়েক কোটি টাকা দাও, আমরা নষ্ট করব।'

আমি ক্রমে ক্রমেই প্ল্যানিং বোর্ডের কাজে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠছিলাম। মুখ্যমন্ত্রীর অফিস থেকে বার বার সার্কুলার যাওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলি দরকারি তথ্য দিত না, প্ল্যানিং বোর্ডের পরামর্শ নেওয়া তো দূর অস্ত। আমি অনেক বার প্ল্যানিং বোর্ড থেকে রেহাই পেতে চেয়েছিলাম কিন্তু শ্রী বিনয় চৌধুরী এবং ড. অসীম দাশগুপ্তের বারণের ফলে পারিনি। ২০০১ সালের নতুন প্ল্যানিং বোর্ডের চেহারা দেখেই আমি প্রমাদ গুণেছিলাম। তাতে কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজের সেক্রেটারি জেনারেল তরুণ দাস এবং আরো দুয়েক জন Private Sector-এর লোককে সভ্য করা হয়েছিল। আমার ভয় দুর্ভাগ্যক্রমে ষোলোআনা সত্য প্রমাণিত হল। সিঙ্গুরের জোরজবরদস্তি জমি অধিগ্রহণ এবং নন্দীগ্রামে পুলিশের গুলিতে ১৪ জনের হত্যা ঘটেছিল। নন্দীগ্রামের পরে অশোকদা বামফ্রন্ট সরকারকে নির্মমভাবে গাল পেড়েছিলেন। যশোধরা, আমি, প্রভাত পট্টনায়েক, প্রসেনজিৎ বসু এবং আরো অনেক বামপন্থী বন্ধু এক প্রতিবেদনে নন্দীগ্রামের পুলিশি জুলুমের বিচারবিভাগীয় তদন্ত দাবি করেছিলাম। যশোধরা তখন পশ্চিমবাংলা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন। সে একই ধরনের স্টেটমেন্ট দিয়েছিল এবং নন্দীগ্রামে দুর্গতদের দেখতে গিয়েছিল। সে খবর এক 'Hindu' ছাড়া আর কোনো কাগজ প্রকাশ করেনি এবং ইচ্ছাকৃত ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করেছিল। এরপর ২০০৬ সালে ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের কাজে ব্যস্ত থাকার অজুহাত দেখিয়ে আমি প্ল্যানিং বোর্ড থেকে নিষ্কৃতি পাই।

দ্বিতীয় অংশ

অশোকদা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিংবদন্তি ছাত্র ছিলেন। প্রায় প্রতিটি পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম হয়েছিলেন, তখনই বিখ্যাত বাংলালিখিয়ে ছিলেন। দেশভাগের পর বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়েছিলেন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি বামপন্থী রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন। বোধহয় ১৯৪৮ সালে এক দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় যুব সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছিলেন, যেখানে কিটি মেননের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। কিছুদিন লখ্‌নৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করার পর তিনি রটারডামে ইয়ান টিনবার্গেনের কাছে পি.এইচডি করতে চলে যান। তখন তিনি কেমব্রিজেও যাতায়াত করতেন, জানি না মরিস ডবের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল কিনা। আমার ধারণা নিশ্চয়ই হয়েছিল তাঁর থিসিস ছিল পোলিশ মার্কসিস্ট অর্থনীতিবিদ মিখহিল কালেস্কির আয়-বণ্টনের উপর। খুবই চমৎকার লেখা। সেটি বই আকারেও প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু পরের প্রজন্ম সে বই ভুলে গিয়েছে। বিদেশ থেকে ফিরে তিনি যোগ দেন ব্যাঙ্ককের United Nations Economic Commission for Asia and its Far East-এ। সেখানে থাকাকালীন তিনি *Economic Weekly*-তে পরিকল্পনা বিষয়ে অনেক বিতর্কে যোগ দিয়েছিলেন। তার মধ্যে আমি শুধু দুটির উল্লেখ করব। একটি হল তিনি দেখিয়েছিলেন যে মহলানবিশের four-sector model-এর ঠিক ঠিক সমাধান করা যায়। তার মধ্যে সর্বোত্তম সমাধান পেতে গেলে চারটি শর্তের একটিকে ছাড়তে হবে। তিনি আরো যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছিলেন যে পরিকল্পনার জন্যে যে জাতীয় আয়ের সংজ্ঞা ব্যবহার হবে, তাতে ছোটো বা প্রান্তিক চাষির নিজস্ব জমির উৎপাদন থেকে তাদের নিজেদের খাওয়া খরচ বাদ দিতে হবে। কারণ তাদের পক্ষে সেই খরচ নিতান্ত আবশ্যিক, তাতে পরিকল্পনার জন্য ট্যাক্স করতে গেলে তাদের ওপর অত্যাচার করা হবে। একই কথা বলা যেতে পারে মেয়েদের সংসারের কাজ ও সন্তান লালনপালনের কাজের সম্বন্ধে।

সেই সময়ে তিনিই বোধহয় ভারতের প্রথম psephologist-এর কাজ করেছিলেন। কী ধরনের নির্বাচকমণ্ডলীর প্রভেদ হলে পরে নির্বাচন প্রক্রিয়ার ফলের ফারাক কী হতে পারে তার হিসেব করেছিলেন। ব্যাঙ্কক থেকে ফিরে তিনি Indian Institute of Management Calcutta-তে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর সময়ে বেশ কয়েক জন বামপন্থী ঐতিহাসিক ও অর্থশাস্ত্রী সেখানে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বরুণ দে ও নির্মল চন্দ্র।

ইকনমিক উইকলির সম্পাদক শচীন চৌধুরীর যখন তাঁর মহাজন সেকসেরিয়াদের সঙ্গে বনিবনা হল না, তখন তিনি Sameeksha Trust নাম দিয়ে একটি ট্রাস্ট খুলে তার জন্যে টাকা তুলতে চেষ্টা করতে লাগলেন। অশোকদা সেই প্রচেষ্টায় একজন প্রধান সহায়ক হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর প্রণোদনায় আমরাও অনেকে সেই ট্রাস্টে টাকা লগ্নি করেছিলাম এবং তার সুফলও তার পর থেকে পেয়েছি। অশোকদা গোড়া থেকে সেই ট্রাস্টের ট্রাস্টি ছিলেন। অবশেষে সেই ট্রাস্টে যাদের তিনি নিয়ে এসেছিলেন যেমন দীপক নায়ার, ধ্রুবনারায়ণ ঘোষ, তারা পর পর দুজন ইকনমিক অ্যান্ড পোলিটিক্যাল উইকলির সম্পাদক—রামমনোহর রেড্ডি এবং পরঞ্জয় গুহঠাকুরতার সঙ্গে এমন স্বেচ্ছাচারিতা করল যে তাঁরা পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। অশোকদা ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁদের চিঠি দিলেন, তারা সে চিঠি পর্যন্ত ছাপল না, তিনি আমাদের সঙ্গে প্রতিবাদপত্রে স্বাক্ষর দিতে বাধ্য হলেন।

১৯৭২ সাল থেকে অশোকদা ইকনমিক অ্যান্ড পোলিটিক্যাল উইকলিতে A.M. নামে Calcutta Diary লিখতে আরম্ভ করেন। সেসব লেখায় তখনকার কলকাতার হতশ্রী অবস্থা, ভাঙো ভাঙো বাড়ি, এবড়োখেবড়ো রাস্তা, দুঃসহ দারিদ্র্য, অজস্র ভিক্ষুক, বেকারের সঙ্গে থাকত রাজনৈতিক অবস্থা, নতুন কবিতা সাহিত্যের আলোচনা আর অশোকদার ক্রিকেটপ্রেমের প্রকাশ। এমার্জেন্সির সময় সেই ডায়েরিতেই সিদ্ধার্থ রায় এবং ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরাচারী শাসনের কঠোর সমালোচনা থাকত। তা ছাড়া তিনি উইকলির জন্যে প্রায়ই সম্পাদকীয়ও লিখতেন। তাঁর সেই ডায়েরিগুলো Calcutta Diary নামে বই হিসেবে প্রকাশিত হয়ে একটা গোটা যুগের আয়না হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অশোকদা বছরখানেক ইন্দিরা গান্ধীর Chief Economic Adviser হিসেবে কাজ করেছিলেন। তার আগে তিনি Agricultural Prices Commission-এর চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করেছিলেন। সেখানে থাকাকালীন তিনি ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক oligarchy-র এবং kulak lobby-র প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়েছিলেন। তিনি গল্প করেছিলেন, একদিন এক রুইয়া এল তুলা-চাষিদের হয়ে বলতে, আরেক রুইয়া এল তুলা ব্যবসায়ীদের হয়ে বলতে, আরেক রুইয়া এল তুলাকলের মালিকদের হয়ে বলতে। সেই Essar Group ভারতবর্ষের একচেটিয়া ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর সভ্য হয়ে দিন-কে-দিন স্ফীত হয়ে চলেছে। আর কুলাকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচিতির ফলশ্রুতি হল তাঁর বিখ্যাত বই Terms of Trade and Class Relations। অনেক সময়ে ভারতের চাষিদের একটি অভিন্ন গোষ্ঠী হিসেবে দেখানো হয়। চৌধুরী চরণ সিং, মহেন্দ্র সিং টিকায়েত, শারদ যাদব এমনকী নরেন্দ্র মোদীও নিজেকে কৃষকপ্রেমিক বলে প্রচার করেন। কিন্তু মার্কসবাদী হওয়ার দরকার নেই, সহজেই বোঝা যায় ভূমিহীন ভাগচাষি বা ২ থেকে ৫ একরের মালিক ক্ষুদ্র বা প্রান্তিক চাষির কত তফাত। অশোকদা শুধু এই ফারাকই দেখাননি, দেখিয়েছেন খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়লে অধিকাংশ সময়ে ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষি ক্ষতিগ্রস্ত, কারণ তাদের বেশিরভাগ চাল, গম, বজরা বাজার থেকে কিনতে হয়। আর খাবারের দাম বাড়লে শ্রমিকের মজুরি বাড়াতে হয় সুতরাং সরকারি বা বেসরকারি শিল্পে বিনিয়োগ ব্যাহত হয় কারণ তাদের সঞ্চয় কমে যায়।

অশোকদার কর্মক্ষমতার আমি একদিন পরিচয় পেয়েছিলাম ইকনমিক অ্যান্ড পোলিটিক্যাল উইকলির অফিসে। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে তিনি একটি economic note লিখলেন, একটি সম্পাদকীয় লিখলেন এবং Calcutta Diary-র একটি কিস্তি লিখলেন। অশোকদা আরো অনেক বই লিখেছেন: Cutting Corners। তাঁর ২০১৭ সাল পর্যন্ত কলকাতার Telegraph কাগজে লেখা কলামগুলি সংকলিত হয়েছে First Person Singular নামে। অশোকদার স্মৃতিশক্তির কোনো তুলনা হয় না, একমাত্র আমার শিক্ষক অধ্যাপক ভবতোষ দত্তর স্মৃতিশক্তির সঙ্গে তার তুলনা হয়। তিনি অধ্যাপক দত্তর মতোই টেলিফোন নম্বর, কবে কার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, কোনো উপন্যাসের বা কাব্যগ্রন্থের নাম এবং বিষয় বলতে পারতেন। তার সঙ্গে অশোকদা মনে করতে পারতেন রবীন্দ্রসংগীতের কলি এবং কোন গান কে গেয়েছিলেন। তাঁর স্মৃতিশক্তির শুধু দুটি উদাহরণ দেব। একটা উদাহরণে তিনি সামঞ্জস্য দেখিয়েছেন পাবনার নরনারায়ণ চৌধুরীর পুত্র শচীন চৌধুরী যিনি ইকনমিক উইকলি এবং ইকনমিক অ্যান্ড পোলিটিক্যাল উইকলির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন এবং আরেকজন সম্পাদক পরাঞ্জয়ের মধ্যে— যিনি ছিলেন ঢাকার প্রভু গুহঠাকুরতার বংশধর। আরেকটা উদাহরণ The story of a small slam। কীভাবে তিনি যেদিন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন কেনেডি আততায়ীর হাতে নিহত হলেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে তাসের বাজি জিতেছিলেন।

বলতে বাধা নেই, 'আরেক রকম' হাতে এলেই আমি প্রথমেই অশোকদার লেখা পড়তাম। 'আরেক রকম' প্রকাশ করে তিনি একদিকে যেমন আমাদের মতো লেখকদের লেখার সুযোগ করে দিয়েছেন, অন্যদিকে 'আরেক রকম'-এর সম্পাদকমণ্ডলী এবং আমাদের মতো লেখকদের ওপর গুরুদায়িত্ব দিয়ে গিয়েছেন যে, আমরা যেন তাঁর বেঁধে দেওয়া মানের থেকে বেশি নীচে চলে না যাই। শেষ কথা বলি, অশোকদা যেমন ভালোবেসে অগণ্য লোককে কাছে টানতে পেরেছিলেন, লোকেদের কাছ থেকে সেরকম ভালোবাসাও তিনি পেয়েছিলেন। তাঁর জন্মদিনের পার্টিগুলিতে তরুণ-তরুণী বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সমাগম দেখার মতো ছিল। অশোকদার ভালোবাসার ক্ষমতার আরেক পরিচয় ছিল তাঁর obituaryগুলি। তিনি শচীন চৌধুরীকে তাঁর অতুলনীয় বাক্যবন্ধ feudal hobo বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। শচীন চৌধুরীর ভাগিনেয়ী ঐতিহাসিক ইন্দ্রাণী রায়ের অকালমৃত্যুতে তিনি একটি মর্মস্পর্শী প্রতিবেদন লিখেছিলেন। তাঁর আরেকটি বিখ্যাত obituary ছিল প্রেসিডেন্সি কলেজের মার্কসবাদী অধ্যাপক সুশোভন সরকারের। তাঁর obituary লেখা দেখে একজন বর্ষীয়ান ঐতিহাসিক আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, অশোকদা যেন তাঁর obituary লেখেন। কিন্তু অশোকদা তাঁর আগেই চলে গেলেন। 'আরেক রকম'-এর সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে এই লেখা লেখার অনুরোধ পাওয়ার জন্যে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব। অশোকদা এবং গৌরীদির কাছে আমি, যশোধরা এবং আমার মেয়েরা যে ভালোবাসা পেয়েছি এটি তার নগণ্য প্রতিদান এবং অভিজ্ঞান।

মিত্র অশোক

আজিজুর রহমান খান

অশোক মিত্রের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৬৯-এর গ্রীষ্মকালে, শ্রীলঙ্কার ক্যান্ডি শহরে, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সমিতির 'দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়ন বিষয়ে এক সম্মিলনীতে। এক সপ্তাহের বেশি সময় আমরা এক ছাদের নিচে সর্বক্ষণ কাটিয়েছি। সম্মিলনীর অংশগ্রহণকারীরা ছিলেন প্রধানত ভারতীয় এবং পাকিস্তানি। পাকিস্তানিদের মধ্যে আমরা পূর্ব-পাকিস্তানিরা ছিলাম সংখ্যাগরিষ্ঠ। ভারতীয়দের মধ্যেও বেশ কয়েক জন বাঙালি ছিলেন। দিনের বেলা অর্থনীতির অধিবেশন, সন্ধ্যা হলেই সমস্ত বাঙালিদের আসর। আমাদের দলের আনিসুর রহমান রবীন্দ্রসংগীত গাইতেন। অশোকদা আড্ডার প্রাণপুরুষ হয়ে উঠেছিলেন। এই সময়ে আমি তাঁর বিপুল মানসিক ঐশ্বর্যের সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করি। অর্থনীতি, রাজনীতি, শিল্প ও সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর অবাধ বিচরণ এবং সর্বোপরি দাক্ষিণ্যপূর্ণ বন্ধুত্বের হাত একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীর পক্ষে অদৃষ্টপূর্ব মনে হয়েছিল। তখন তিনি ভারত সরকারের কৃষি মূল্য কমিশনের সভাপতি। সম্মিলনীর এক অধিবেশনে কোনো এক অংশগ্রহণকারীর বক্তব্য কে.এন. রাজ খুব অপছন্দ করেছেন। বিরতির সময় তিনি অশোকদাকে বললেন 'অশোক, তোমাকে এর একটি কড়া জবাব দিতে হবে,' অশোকদার তাৎক্ষণিক জবাব 'রাজ, আমি যে মিত্র অশোক, রুদ্র অশোক নই।'

সম্মিলনীতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অশোক রুদ্রও ছিলেন; জনশ্রুতি যে, রুষ্ট হলে তিনি অগ্নিবৃষ্টি করতেন। অশোকদার স্বকথিত এই মিত্র রূপটিই সেই থেকে আমার মনে গাঁথা হয়ে গেছে। প্রথম পরিচয়েই আরো একটি বিষয় সম্পর্কে সচেতন না হয়ে উপায় ছিল না; আমার মতো অপাংক্তেয়দের প্রতি তাঁর স্নেহ দৃষ্টির একটি কারণ এই যে আমরা বাংলাদেশের লোক, যে দেশে তাঁর শৈশব আর প্রথম যৌবন কেটেছে, যে দেশ তাঁর মাতৃভূমি।

এই প্রথম পরিচয়ের পর থেকে প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল অশোকদার সঙ্গে আমার যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন ছিল। তাঁকে নানা ভূমিকায় দেখার এবং চেনার সুযোগ পেয়েছি। তবু ফাঁক থেকে গেছে এই কারণে যে তাঁর নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে— ভারতে এবং পশ্চিমবঙ্গে— তাঁর দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্ম কাছে থেকে এক নাগাড়ে দেখার সুযোগ পাইনি। তা সত্ত্বেও তাঁর বিশ্বাস ও কর্মের জগতের একটি চিত্র আমার মনে তৈরি হয়েছে। গত কয়েক দিন ধরে পত্র-পত্রিকায় তার বিপুল সৃষ্টি ও কর্মের নানা দিক সম্বন্ধে বেশ কিছু আলোচনা পড়েছি। আমার নিজের মনে যে চিত্র রচিত হয়েছে তার মোটামুটি সমর্থন এইসব আলোচনায় পেয়েছি, তবে দু-একটি অসঙ্গতিও লক্ষ করেছি।

অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে মার্কসবাদ ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি আনুগত্য তাঁর কর্ম ও চিন্তাকে পরিচালিত করেছে এমন একটি কথা অনেকেই বলেছেন। বিদ্যমান সমাজতন্ত্রের পতনের কারণ হিসেবে এই ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ অসঙ্গতিকে দায়ী করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। নব্বই-এর দশকে একবার তাঁর সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করার সময় তিনি বলেছিলেন 'এ বয়সে আমার পক্ষে ধর্মান্তরিত হওয়া সম্ভব নয়।' কিন্তু তাঁর মধ্যে তাত্ত্বিক গোঁড়ামি সমাজতন্ত্র-ভাবনার গুণ-নির্ধারণের প্রয়োজন বোধের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়িয়েছিল একথা আমার মনে হয় না। অশোকদা নিজেই নিজেকে 'গোঁড়া, অপরিমার্জিত' মার্কসবাদী বলে বর্ণনা করেছেন (উদাহরণ: ফার্স্ট পারসন সিঙ্গুলার, পৃ: ৩০৩)। কিন্তু আমার পক্ষে এই বর্ণনাকে আক্ষরিক সত্য বলে মানতে অসুবিধা হয়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে দু-একটি উদাহরণ দিই। তিনি জানতেন যে বিদ্যমান মার্কসীয় সমাজতন্ত্রকে আমি 'অর্থনীতিতে নৈপুণ্যহীন, সামাজিকভাবে অরাজক, নান্দনিকতায় বন্ধ্যা এবং রাজনীতিতে নিপীড়ক' বলে বর্ণনা করেছি। কিন্তু যে দীর্ঘ প্রবন্ধে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি সেই প্রবন্ধটি তিনি একান্ত নিজস্ব উদ্যোগে *আরেক রকম-এর* দুই সংখ্যায় প্রকাশ করেছেন (১ ও ১৬, অক্টোবর ২০১৩)। ভারতীয় রাজনৈতিক বিতর্কে তিনি বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। তাঁর প্রবন্ধ সংকলন ফার্স্ট পারসন

সিঙ্গুলার সম্বন্ধে আলোচনা নিবন্ধে আমি ভারতের বিশ্বায়নকে পশ্চিমবঙ্গ প্রমুখ পশ্চাদ্‌পদ রাজ্যগুলির জন্য বিশেষভাবে অবিমিশ্র মঙ্গলদায়ক বলে বিতর্ক করেছি। সে প্রবন্ধ *আরেক রকম*-এ ছাপা হয়েছে (যুগ্ম সংখ্যা অক্টোবর ২০১৬)।

তিনি যৌবনকাল থেকে জীবনানন্দ দাশ ও বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। একথা সর্বজনবিদিত যে পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টি বিভিন্ন সময়ে এই দুই কবিকে তীব্রভাবে সমালোচনা করেছে। অশোকদা এই সমালোচনা দিয়ে প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে জানি না। এই কবিদের নিয়ে, বিশেষত জীবনানন্দ সম্বন্ধে তাঁর সোৎসাহ এবং সশ্রদ্ধ রচনা তাঁদের মৃত্যুর বহুকাল পরেও প্রকাশিত হয়েছে।

ইংরেজি এবং বাংলায় তিনি অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত প্রবন্ধের সংকলন দুই ভাষাতেই অনেকগুলি জনপ্রিয় গ্রন্থ হিসেবে সুপরিচিত। ইংরেজি ভাষায় প্রবন্ধকার রূপে তাঁর খ্যাতি সর্বভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক। কিন্তু তাঁর যাবতীয় সৃষ্টিকর্মের মধ্যে অভিনবত্বে সর্বাগ্রগণ্য তাঁর বাংলা গদ্যরীতি। ক্রিয়াপদের সীমিত ব্যবহার, বেশি-নয় কম-নয় তৎসম শব্দের যথাযোগ্য ঝংকার তাঁর গদ্যভাষাকে গতিবান করেছে। সমকালীন বাংলা লেখকদের গদ্য রচনা থেকে তাঁর পদ্যরীতি স্বতন্ত্র এবং স্বকীয়তায় বিশিষ্ট।

যতই তিনি এবং অন্য অনেকে তাঁকে কট্টর মার্কসবাদী, 'ভদ্রলোক নন, কমিউনিস্ট' পরিচয় দিন না কেন আমার বিচারে তিনি ছিলেন উদারপন্থী মানবিকতার প্রতিমূর্তি (আমি জানি কমিউনিস্টদের অভিধানে এটি একটি গালি।) অসাম্প্রদায়িকতা এবং আন্তর্জাতিকতা ছিল তাঁর বিশ্বাসের জগতের প্রধান স্তম্ভ। রবীন্দ্রনাথ-গান্ধী-নেহরুর ভারতে যখন সাম্প্রদায়িক নিধন যজ্ঞের হোতাদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন সাম্প্রদায়িক সীমারেখাকে সর্বতোভাবে নিশ্চিহ্ন করার সংগ্রামের প্রথম সারিতে ছিলেন অশোক মিত্র। ১মে ঢাকায় 'প্রথম আলো' দৈনিকপত্র অশোক মিত্রের মৃত্যু সংবাদের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধে ইমানুল হক-এর একটি ছোটো প্রবন্ধ ছেপেছে। প্রবন্ধটির শেষ দিকে ইমান অশোকদার পরিচয় লিখেছেন 'আমার পিতা'। ইমানের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। নাম থেকে অনুমান করি জন্মসূত্রে তিনি মুসলমান ধর্ম, বর্ণ, জাতি নির্বিশেষে একটি প্রজন্মের পিতৃত্বের যে-অধিকার এই নিঃসন্তান মানুষটি অর্জন করেছিলেন ইমানের লেখা দুটি-শব্দের এই বাক্যটি তার অকুণ্ঠ সমর্থন। ইমানকে ধন্যবাদ।

অশোক মিত্র: একটি ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ

জয়তী ঘোষ

আরেক রকম পত্রিকায় অশোক মিত্রকে নিয়ে লিখতে পেরে গর্বিত বোধ করছি, কারণ এই পত্রিকাই তাঁর জীবনের শেষ প্রেম। একভাবে দেখতে গেলে, *আরেক রকম* পত্রিকার অস্তিত্ব, অশোক মিত্র ও তাঁর অসাধারণ ক্ষমতার বার্তাবাহক। একবার ভেবে দেখুন যে একজন ব্যক্তি তাঁর জীবনের নবম দশকে ইতিমধ্যেই প্রবেশ করেছেন, কিন্তু তাঁর উদ্যম ও শক্তি রয়েছে একটি নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করার, একটি সম্পূর্ণ নতুন পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করার। যার মূল লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গের বৌদ্ধিক জগতের পুনরুজ্জীবন, যেই জগৎ সর্বদা তাঁর হৃদয়ের কাছাকাছি ছিল। কল্পনা করুন একজন ব্যক্তির যাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে, যিনি পত্রিকার লেখা পড়তে পারছেন না, কাউকে দিয়ে লেখা পাঠ করাতে হচ্ছে, তিনিই আবার এই পত্রিকার প্রতি সর্বাধিক নিবেদিত, পরিশ্রমী এবং কঠোর সম্পাদক, যিনি লেখকদের তাগাদা দিচ্ছেন, প্রুফ দেখার চেষ্টা করছেন, ক্ষুদ্রতম ভুল যাতে না থাকে তা নিয়ে সচেষ্ট, পত্রিকার গুণগত মান যাতে প্রত্যেক সংখ্যায় বজায় থাকে তা নিয়ে সদা চিন্তিত আবার পত্রিকার নীতি সংক্রান্ত আলোচনা করার জন্য নিয়মিত সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠক আয়োজন করছেন। এই পত্রিকা চালিয়ে যাওয়ার অনেক কারণ নিশ্চিতভাবে আছে। তার সঙ্গে আমি বলব, শুধুমাত্র অশোক মিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য, তাঁর ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, এই পত্রিকা যেন আরো সমৃদ্ধির দিকে ক্রমাগত এগিয়ে যায়।

অশোক মিত্রের মতন অসাধারণ মানুষ ও তাঁর কীর্তি নিয়ে অনেক নিবন্ধ ইতিমধ্যেই লেখা হয়েছে এবং হবে— একজন প্রকৃত জনগণের বুদ্ধিজীবী (public intellectual) হিসেবে তাঁর সুমহান অবদান; রাজনীতি ও নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা; স্বাধীন ভারত ও পশ্চিমবঙ্গের বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও প্রক্রিয়ায় তাঁর অসাধারণ অবদান; ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই তাঁর দুরন্ত ও নান্দনিক গদ্য; তাঁর সমগ্র জীবন জুড়ে প্রগতিশীল চিন্তা ও কাজের প্রতি অঙ্গীকার; এবং প্রগতিশীলতার প্রতি তাঁর অনন্য সততা যার ফলে তিনি কখনো ক্ষমতার মুখের উপর সত্য বলতে পিছপা হননি, এমনকী, নিজের বন্ধু ও কমরেডদের প্রতিও সত্য বলতে তিনি কখনো ভয় পাননি— এই সমস্ত বিষয় নিয়েই চর্চা চলবে। এককভাবে এই প্রত্যেকটি গুণ দুর্লভ। কিন্তু যা আরো দুর্লভ তা হল একজন মানুষের মধ্যে এই প্রত্যেকটি গুণাবলী একসঙ্গে পাওয়া। অশোক মিত্রকে আমি ছোটোবেলা থেকে পিতৃসম ব্যক্তি হিসেবে দেখে এসেছি। এই নিবন্ধে আমি আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে চাই ব্যক্তিগত স্মৃতি রোমন্থনে।

আমার বাবার পরে, অশোককাকা (যেই নামে আমরা তাঁকে ডাকতাম), বোধহয় ছিলেন আমার জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মানুষ যিনি আমার বৌদ্ধিক চেতনার উন্মেষ ও জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিকে সর্বাধিক প্রভাবিত করেছেন। আমার দিদি ও আমি বড়ো হয়েছি অশোক মিত্র ও তাঁর স্ত্রী গৌরীদেবীর (যাকে আমরা অশোক-কাকিমা বলে ডাকতাম), উষ্ণ স্নেহ ও অকৃত্রিম ভালোবাসার ছত্রছায়ায়। তাঁরা আমাদের কাছে মা-বাবার মতোই কাছের মানুষ ছিলেন। আমরা বড়ো হতে হতে ভাবতাম (যেভাবে শিশুরা ভাবে) যে আমাদের বাবা-মা-র মতোই এই গুরুজনেরা সর্বদা আমাদের জন্য থাকবেন, আমাদের বিপদে-আপদে রক্ষা করবেন, প্রশংসা করবেন, আবার বকবেন, ধমক দেবেন, আমাদের জীবন ভাগ করে নেবেন।

ওনার কমবয়সি মানুষজন ও শিশুদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার এক অসাধারণ ক্ষমতা আজীবন বজায় ছিল। তাঁর থেকে বয়সে ঢের ছোটো ব্যক্তি কী ভাবছে, কী নিয়ে চিন্তা করছে, কী করছে, তা নিয়ে প্রকৃতভাবে কৌতূহলী ছিলেন। বিশেষ করে, বেশ কয়েক প্রজন্মের মহিলারা বলতে পারবেন কীভাবে শিশু হিসেবে তারা তাঁর কাছাকাছি এসেছিলেন, এবং কীভাবে বহু বছর ধরে প্রত্যেকের সঙ্গে তাঁর একটি ব্যক্তিগত এবং বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত অবধি তিনি সদ্য যৌবনে পা দেওয়া ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। তিনি তাদের বুঝতে পারতেন, তাদের সাফল্যে গর্বিত হতেন। তাঁর মৃত্যুর কিছু মাস আগে তিনি আমাকে বলেছিলেন যে

নয়নতারা-র (নিত্যা ঘোটগের কন্যা, যিনি তাঁর বন্ধু সামবামূর্তির কন্যা, যাঁর সঙ্গে তিনি আগে চিঠি চালাচালি করতেন) চিঠি পেলে তিনি খুশি হন। আমার দিদির কন্যা মেঘনা-র বড়ো হয়ে ওঠা নিয়ে তিনি গর্বিত হতেন, কারণ সে নিজের গবেষণার কাজে এক মাসের বেশি সময় সুন্দরবনের গ্রামে কাটায়। আমার কন্যা জাহ্নবীর সমস্ত লেখালেখি তিনি পড়তেন। তাঁর জীবনের শেষ বছরে তিনি তাকে আরো ভালো করে চিনতে পারেন, যখন জাহ্নবী তারুণ্যে উত্তীর্ণ। আমি খুশি যে তাঁর এই দাবি আমি মেটাতে পেরেছিলাম। আমার দিদির নাতি ও নাতনিদের ব্যাপারে নিয়মিত খোঁজখবর নিতেন এবং তাঁদের দুষ্টুমির গল্প শুনে ও বলে আনন্দ পেতেন। আমার ভাইঝি কাজরীর তাঁকে ঘনশ্যাম বলে ডাকা নিয়ে তিনি খুব মজা পেতেন। এই শিশু, তরুণ-তরুণীরা তাঁদের মা-বাবা-কাকা-জ্যাঠা, বা দাদু-দিদার মতোই অশোককাকার সঙ্গে এক অপত্য স্নেহে আবদ্ধ ছিল।

একইভাবে তিনি অন্যান্য যুবক-যুবতীদের সঙ্গেও একাত্মবোধ করতেন, বিশেষ করে যারা বাম আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। যারা আদর্শবাদী, আপোশহীন প্রশ্নকারী এবং বিদ্রোহী, তাদের প্রতি তিনি অদ্ভুত আকর্ষণ বোধ করতেন। কিন্তু তাদেরকেও কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হত। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমলাতান্ত্রিক হয়ে পড়লে, তিনি ব্যথিত হতেন, কিন্তু তাদের প্রতি স্নেহ বজায় থাকত। যারা বিপরীতধর্মী মত রাখার জন্য তিরস্কৃত হয়েছেন বা অবহেলিত হয়েছেন, তাদের জন্য তাঁর হৃদয়ে একটি বিশেষ জায়গা ছিল, যদি তিনি বিশ্বাস করতেন যে তারা তাদের আদর্শের প্রতি সৎ। তাঁর ব্যবহারে বয়স বা অভিজ্ঞতার জন্য কোনো উচ্চ আসন কাঙ্ক্ষিত ছিল না। কনিষ্ঠদের সঙ্গে তিনি সহজভাবে মিশতে পারতেন।

অশোক মিত্র প্রবলভাবে সামাজিক ব্যক্তি ছিলেন। সমস্ত পেশার প্রায় সমস্ত মানুষকে উনি ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন। তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তির জন্য তিনি বিভিন্ন মানুষ সম্পর্কে খুঁটিনাটি জানতেন, বিবিধ কাহিনি বলতে পারতেন, যা তারা নিজেরাই হয়তো ভুলে গেছে। অল্পবয়সের একটি ঘটনা এখনও মনে আছে। উনি দিল্লি এলে আমি তাঁর সঙ্গে গোটা শহরজুড়ে বিভিন্ন শিল্পী, অর্থনীতিবিদ, সাংবাদিক, আমলাদের বাড়ি ঘুরতাম। আগাম খবর না দিয়ে অশোককাকা তাঁদের বাড়ি চলে যেতেন, কোনো খাবার বা পানীয় গ্রহণ করতেন না, সাধারণ এবং তীক্ষ্ণ কিছু প্রশ্ন করে তাঁরা কেমন আছেন কী করছেন, কী ভাবছেন ইত্যাদি খবরাখবর নিতেন এবং হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে তাঁদের বিদায় জানিয়ে বেড়িয়ে আসতেন। একবার এইরূপ একটি ঝটিকা সফরে আমরা প্রায় হাফ ডজন বাড়ি আধা দিনে হানা দিয়ে আসার পরে, তিনি বললেন যে বেশ কয়েক মাসের জন্য তাঁর বন্ধুদের বিবিধ খবর পেয়ে তিনি সন্তুষ্ট!

অশোককাকা আড্ডা দিতে অসম্ভব ভালোবাসতেন, এবং দারুণ আড্ডা দিতেন। বছরের পর বছর ধরে বিভিন্ন জায়গায়, কিন্তু বিশেষ করে আলিপুর পার্ক রোডের সোনালি অ্যাপার্টমেন্টে তিনি ও অশোক-কাকিমা, অসাধারণ খাবার সহযোগে অতিথি আপ্যায়ন করে আনন্দ পেতেন। তাঁদের আতিথেয়তার দরুণ এমন একটি বাতাবরণ সৃষ্টি হত যেখানে সমস্ত রকমের আলাপ-আলোচনা এবং আড্ডা জমে উঠত। বিশেষ করে, রবিবার সকালে তাঁদের বাড়ির আড্ডা অসাধারণ হত, যেখানে কবি, রাজনীতিবিদ, আমলা, ছাত্র, শিল্পী, গবেষক, রাজনৈতিক কর্মী এবং আরো বিবিধ মানুষ একত্রিত হতেন।

এই আড্ডাগুলি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠার একটি কারণ ছিল অশোককাকার বিভিন্ন ধরনের গল্প। ঠিক সময়ে ঠিক গল্প বলে আড্ডা জমিয়ে দেওয়ার অনন্য ক্ষমতা ছিল তাঁর। আমার মনে আছে, তাঁর মৃত্যুর কিছু মাস আগে তাঁর কিছু পুরোনো বন্ধু নৈশভোজে সমবেত হয়েছিলাম তাঁর বাড়িতে। যেহেতু অশোককাকা ভালো শুনতে পেতেন না, তাই তিনি অধিকাংশ সময় নীরব ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ, বলে উঠলেন, এখন আমি একটা গল্প বলব। তারপরে তিনি আমাদের পরিচিত কিছু ব্যক্তিদের নিয়ে অসাধারণ কিছু গল্প বলেছিলেন, যা আমি প্রথম বার শুনলাম, এবং যার ছত্রে ছত্রে তাঁর সহজাত কৌতুকবোধ।

আবার কখনো তিনি অত্যন্ত ঠোঁটকাটা ও শ্লেষাত্মক হতে পারতেন। একাধিক বন্ধু তাঁর ক্ষুরধার জিভের আঘাতে জর্জরিত হয়েছেন, যা কখনো খুবই বেদনাদায়ক হতে পারে। কিন্তু তাই বলে তিনি কারোর প্রতি আক্রোশ রাখতেন না। তাই অধিকাংশ সময়ে তিনি তাঁর কশাঘাতের জন্য অনুতপ্ত হতেন এবং মিটমাট করে নেওয়ার চেষ্টা করতেন। কিন্তু এই নিয়মের ব্যতিক্রম হত। যাঁদের প্রতি তাঁর ঘৃণা উদ্রেক হত, তাঁদের সংস্পর্শ কাটাতে তিনি পিছপা হতেন না। বাম দল ও বাম সরকারের বিরুদ্ধে তিনি যে ক্ষুরধার সমালোচনা করেছিলেন, তারা তা পাত্তা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেনি বলে তিনি নিশ্চিতভাবে ব্যথিত হয়েছিলেন। কিন্তু যেই গভীর আবেগ দিয়ে তিনি তাঁর সমালোচনা করেছিলেন, তার মধ্যে নিহিত ছিল প্রগতিশীল রাজনীতির প্রতি তাঁর সুদৃঢ় অঙ্গীকার ও ভালোবাসা।

বন্ধু ও পরিচিতির তাঁর যে প্রকাণ্ড বৃত্ত ছিল, তা আমাকে রীতিমতো অবাক করত। যখন ১৯৭৭ সালে তিনি প্রথম বার ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি সমর্থিত প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, আমার দিদি ও আমি তাঁর প্রচারে শামিল হয়েছিলাম। তার আগে, আমি কিছুটা সংশয়ী হয়েই তাঁর প্রচারের জন্য চাঁদার আবেদন করেছিলাম। সেই আবেদনে যে অভূতপূর্ব সাড়া পাই, তা আমার সমস্ত প্রত্যাশার বাইরে ছিল। বরিষ্ঠ ও রক্ষণশীল আমলা থেকে শুরু করে সাংবাদিক, ছাত্র

হয়ে সমাজের প্রায় সব স্তরের মানুষ তাঁর প্রচারে চাঁদা দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু এই প্রচারে আমাদের অবদান অবশ্য বিতর্কিত: বহু বছর পরেও অশোককাকা গর্ব করে বলতেন যে দুই ইংরেজিভাষী তরুণী দিল্লি থেকে এসে তাঁর প্রচার করার পরেও যে তিনি জিতেছেন, তা কম কৃতিত্বের নয়!

কখনো কখনো আবার অশোককাকা বেফাঁস কথা বলে অন্যদের লজ্জায় ফেলতেন। আমার এখনও মনে আছে, বহু দশক পূর্বে আমার অবিমৃশ্যকারিতা-জনিত লজ্জাকর পরিস্থিতি বহুগুণ বেড়ে যায় অশোককাকার কাণ্ডকারখানায়। আমি তখন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। প্রথম দুই মাস সেখানে অতিবাহিত করার পরে আমি তাঁকে একটি লম্বা চিঠি লিখি, আমার কিছু শিক্ষক-শিক্ষিকা সম্পর্কে কিছু অকপট ও কিঞ্চিৎ নিন্দাকর মন্তব্য করে। মনে হয়, চিঠিটি পড়ে তিনি খুব মজা পান— এতটাই যে তার পরের কয়েক মাস ধরে তাঁর বাড়ির বিভিন্ন অতিথিদের তিনি চিঠিটি পড়ে শোনান, যাঁদের মধ্যে একজন আবার আমার কেমব্রিজের শিক্ষিকা, যাঁকে নিয়ে আমি খুব ভালো কথা সেই চিঠিতে বলিনি! সেই শিক্ষিকার কৃতিত্ব যে তিনি এই চিঠি লেখার জন্য আমাকে কোনো তিরস্কার করেননি, কিন্তু তবু, এই কাণ্ডের কথা মনে পড়লে আজও আমি লজ্জিত হই। সেই চিঠিতে জোয়ান রবিনসন, অশোককাকার রাজনীতিতে আসা নিয়ে কী বলেছেন তাও লিখেছিলাম— 'সিপিআই(এম) মন্দের ভালো বললে কিছুই বলা হয় না। অশোক মিত্র misguided হয়েছেন এবং আগামীদিনে আরো বেশি হবেন', তিনি আমাকে একটি পার্টিতে এই কথা বলেন। কিছুদিনের মধ্যেই অশোককাকা জোয়ান রবিনসনের কাছে এই বক্তব্যের জবাবদিহি চান এবং বলেন যে এই বক্তব্য তিনি আমার চিঠি পড়ে জানতে পেরেছেন। এই ঘটনা যে জোয়ান রবিনসনের খুব পছন্দ হয়নি, তা বলাই বাহুল্য। আমি ঠেকে শিখেছিলাম যে অশোককাকা ভাবতেন যে সবাই তাঁর মতনই সমালোচনাকে মেনে নিতে পারে, ভুল বোঝাবুঝি না করে।

এতদ্‌সত্ত্বেও অশোককাকা একজন অত্যন্ত ব্যক্তিগত মানুষ ছিলেন, বিশেষ করে নিজের ব্যাপারে। তাই নিশ্চিতভাবেই তাঁর জীবনের শেষ পর্যায় অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ও কঠিন ছিল। কারোর প্রতি শারীরিকভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়াকে তিনি ঘৃণা করতেন, মনে-প্রাণে তার বিরোধিতা করতেন। তাঁর ব্যক্তিগত পরিসর ও স্বাধীনতা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে যখন তাঁর শারীরিক দুর্বলতার জন্য তাঁর সহায়তার প্রয়োজন পড়ল, তখনও তিনি তা নিতে অস্বীকার করতেন। তাঁর জীবনের শেষ কয়েক বছর নিশ্চিতভাবেই খুবই কঠিন ছিল— একা থাকতেন, রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি যে দিকে যাচ্ছে তা তাঁকে প্রবলভাবে ব্যথিত করত, যদিও সেই রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতির পূর্বাভাস তিনি আগেই দিয়েছিলেন, তাঁকে প্রবল শারীরিক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে, একে একে দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি দুই চলে যায় (যিনি আজীবন লিখিত শব্দের মধ্যে বাঁচলেন, তাঁর জন্য এ এক ভয়াবহ পরিণতি)। কিন্তু এত প্রতিকূলতার মধ্যেও তাঁর মস্তিষ্ক, চিন্তাভাবনা ক্ষুরধার ছিল।

অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও অন্তরের সম্পদ ছিল বলেই জীবনের সায়াহ্নে শত প্রতিকূলতার মধ্যেও তাঁর মানসিক চিন্তার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ছিল। গত বছর কোনো এক সন্ধ্যের স্মৃতি আমার মনে পড়ছে। তাঁর পড়ার ঘরে আমি ঢুকলাম, যেখানে তিনি অন্ধকারের মধ্যেই বসে থাকতেন কারণ, চোখে দেখতে পেতেন না বলে, আলো ও অন্ধকার তাঁর কাছে এক। আমি ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কী ভাবছেন। উত্তরে বললেন, রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গান মনে করছেন, বিশেষ করে একটি গানের কলি তাঁর মনে পড়ছে, 'শান্ত সুরের সান্ত্বনা'। তার পরে আমার দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে জিজ্ঞেস করলেন, 'জিএসটি-র বিরুদ্ধে মামলা করার সম্ভাবনা কিছু আছে কি? অন্তত, একটা যথাযথ বিবৃতি প্রকাশ করো'।

অশোককাকা

অভিরূপ সরকার

Rose, oh pure contradiction, delight / of being no-one's sleep under so many / lids.

—Rainer Maria Rilke

অশোক মিত্র, আমার বাবা অরুণকুমার সরকারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আমি তাঁকে অশোককাকা বলতাম, কোনো কোনো রবিবার সকালে আমাদের বাড়িতে আসতেন ষাট দশকের গোড়ার কথা বলছি। যে সময়ের কথা বলছি, তখন আমাদের বাড়িতে খানিকক্ষণ বসে আড্ডা মারার তেমন ব্যবস্থা ছিল না। বাড়িতে অনেক লোক, চেঁচামেচি, হই-হট্টগোল, সিঁড়ি দিয়ে উঠেই নর্দমা, আলাদা করে কোনো বসার ঘর পর্যন্ত নেই। বাবাকে নিয়ে অশোককাকা চলে যেতেন কাছেই সত্যেন দত্ত রোডে নরেশ গুহ-র বাড়িতে। নরেশকাকা বাড়িতে বেলা দুপুর অব্দি আড্ডা চলত। কখনো কখনো আড্ডা গড়িয়ে যেত বুদ্ধদেব বসুর দুশো দুই রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-র বাড়ি অব্দি। আড়াইটে-তিনটে বেজে গেছে, বাবা তখনও বাড়ি ফেরেনি, মা না খেয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ঠায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে, এই ছবিটা মনে গেঁথে রয়েছে।

সেই সময়ে, যতদূর মনে পড়ছে, অশোককাকারা মিন্টো পার্কের পেছনে একটা বহুতলের সাত কিংবা আট তলায় থাকতেন। অশোককাকার একটা মস্ত বড়ো সাদা ফোর্ড গাড়ি ছিল যার চালকের আসনটা ছিল বাঁ-দিকে। মাঝে-মাঝে অশোককাকা নিজেই গাড়ি চালাতেন, ক্বচিৎ কদাচিৎ গৌরীকাকিমাকেও চালাতে দেখেছি। মনে আছে, একবার বাবা-মা'র সঙ্গে অশোককাকার মিন্টো পার্কের বাড়িতে গিয়েছিলাম। লিফটে চেপে ওপরে ওঠাটাই একটা নতুন অভিজ্ঞতা, তার ওপর ওখানে যাবার পর রেফ্রিজারেটর থেকে একটা আস্ত চকোলেট লাভ হল। আমাদের বাড়িতে তখন রেফ্রিজারেটর ব্যাপারটা স্বপ্নের মতোই ছিল। বাড়িতে চকোলেট রাখা ব্যাপারটাও। চকোলেটের হিম-ঠান্ডা স্বাদ, অশোককাকার মস্ত বসার ঘর, অত ওপর থেকে দেখা ছুটির কলকাতা শহর, দেশলাই বাক্সের আকারে গাড়ি, পাশে শ্যামল-সবুজ মিন্টো পার্ক— সবমিলিয়ে সে এক আশ্চর্য, অলৌকিক জগৎ, আগে কখনো সে জগতের অনুভূতি হয়নি।

মাঝের কয়েকটা বছর অশোককাকারা দিল্লি চলে গিয়েছিলেন। বাবার সঙ্গে চিঠিপত্রে যোগাযোগ ছিল, কিন্তু দেখাসাক্ষাৎ, বলাই বাহুল্য, তেমন ঘটত না। ১৯৬৮-৬৯ সাল নাগাদ আমার ন-কাকা, কবি আলোক সরকার, সস্ত্রীক দিল্লি বেড়াতে যান। তাঁরা ফিরে আসার পর, ন-কাকিমার কাছে অশোককাকার পরিবার এবং দিল্লি প্রবাসী বাঙালি কবি লোকনাথ ভট্টাচার্যের পরিবারের গল্প খুব শুনতাম। এর কিছুদিন পরে আশোককাকা দিল্লির চাকরি ছেড়ে কলকাতায় ফিরে এলেন, শুনেছিলাম ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর বনছিল না। ফিরে এসে কয়েক বছর ল্যান্সডাউন রোডের একটা বাড়িতে অশোককাকারা থাকতেন। তাঁদের আলিপুরের ফ্ল্যাটটা তখনও তৈরি হয়নি। অশোককাকা ফিরে আসার পর বাবাদের পুরোনো আড্ডাটা আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে। এর কিছুদিন পরে আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে অর্থনীতি নিয়ে ভর্তি হই, যার পেছনে অশোককাকার বিরাট অবদান ছিল।

ইতিহাসের নিয়মে কলকাতার চালচিত্রটা তখন একটু একটু করে বদলে যাচ্ছে। শহরের দেয়ালে টুপি পরা চিনের চেয়ারম্যানের রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ে ম্লান হয়ে আসা প্রতিকৃতির পাশে জ্বলজ্বল করছে এশিয়ার মুক্তিসূর্যের ছবি। প্রেসিডেন্সি কলেজের পোর্টিকোয় বন্দেমাতরম ধ্বনি দিয়ে নিয়মিত নকশাল পেটানো হচ্ছে, ঠিক যেমন করে পাঁচ বছর আগে নকশালরা বন্দেমাতরমওয়ালাদের পেটাত। বয়সের ধর্ম মেনে যা কিছু হাতের কাছে পাচ্ছি গোগ্রাসে গিলছি— বাংলা কবিতা, ফরাসি উপন্যাস, আগাথা ক্রিস্টি, ওডহাউসের পাশাপাশি ডিকেন্স-কনরাড, বিভূতিভূষণ-তারাশঙ্কর-মানিক। যা পড়ছি তার অনেকটাই বদহজম হচ্ছে, কিন্তু যেটুকু চুইয়ে চুইয়ে ভেতরে চলে যাচ্ছে তার দামও কম নয়। এদিকে পরীক্ষা এসে গেছে, পরীক্ষার পড়া তেমন তৈরি হয়নি। বিশেষ করে ভারতীয়

অর্থনীতির একটা পেপার ছিল, যেটার সিলেবাস এতটাই ছড়ানো যে তার পুরোটার নাগাল পাওয়া আমার মতো অমেধাবী, অমনোযোগী ছাত্রের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। একদিন সকালে অশোককাকার ল্যান্সডাউনের বাড়িতে গিয়ে কাঁচুমাচু হয়ে আমার সমস্যার কথা বললাম। অশোককাকা বললেন, ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি বলে একটা পত্রিকা বেরোয়। সেটা নিয়মিত পড়লে ভারতীয় অর্থনীতি নিয়ে একটা পরিষ্কার ধারণা হয়ে যাবে। তারপর নিজেই চিঠি লিখে আমাকে ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি বা ইপিডব্লু ছাত্র-সদস্য করিয়ে দিলেন। পরে দেখা হলে জিজ্ঞেস করতেন, ইপিডব্লুটা নিয়মিত পড়ছ তো?

আর কিছু পড়ি না পড়ি, প্রতি সপ্তাহে অশোককাকার লেখা কলামটা খুব মন দিয়ে পড়তাম। সেই সময়ে এবং তার পরেও বহুদিন এ এম ছদ্মনামে অশোককাকা যে ইপিডব্লু-তে ক্যালকাটা ডায়েরি বলে একটা সাপ্তাহিক কলাম লিখতেন, সেটা তো সকলেরই জানা। ক্যালকাটা ডায়েরি পড়তে পড়তে অশোককাকার ইংরেজির বেজায় ন্যাওটা হয়ে পড়লাম, এতটাই যে, অর্থনীতি বিভাগের হাতে লেখা ক্ষণজীবী দেয়াল পত্রিকায় ইংরেজিতে একটা লেখা লিখলাম যার শব্দ-বর্ণ-গন্ধ সবই এ এম-এর। অর্থাৎ সোজাসুজি বলতে গেলে, যার সিংহভাগ ক্যালকাটা ডায়েরি থেকে স্রেফ টুকলি। এ-নিয়ে বন্ধুদের বিদ্রুপ শুনতে হয়েছিল।

বিএ পাশ করার পর কোথায় এমএ পড়ব তা কিছুটা দ্বিধায় ছিলাম। সেইসময়, প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বিএ পাশ করে দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিক্স-এ পড়তে যাবার প্রবণতা কিছুটা শুরু হয়েছে। অশোককাকা বললেন, এমএ পড়ার জন্য দিল্লি যাবার কোনো দরকার নেই। দিল্লির মতো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অত চাকচিক্য হয়তো নেই, কিন্তু এখানে বহু যোগ্য মাস্টারমশাই আছেন যাঁদের সান্নিধ্যে এসে অর্থনীতি শেখাটা পরম ভাগ্যের ব্যাপার। পরের দু-বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় কথাটার যাথার্থ্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলাম। বস্তুত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ পড়ার দু-বছর আমার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সময়।

এমএ পাশ করার পর একটা বছর কিছু অস্থিরভাবে কাটল। ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট-এ তাদের মূল স্রোত ম্যানেজমেন্ট-এর স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা (যার পোশাকি নাম পিজিডিএম) কোর্সটির পাশাপাশি ফেলো ইন ম্যানেজমেন্ট বলে আর একটি কোর্স চালু আছে যেটি ম্যানেজমেন্ট-এ পিএইচডি-র সমতুল্য। কলকাতার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট-এ তখন কয়েক জন অত্যন্ত মেধাবী অধ্যাপক পড়াচ্ছেন। তাঁদের নাম দেখে আমি ফেলো ইন ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামে দরখাস্ত করলাম, ক্যাট পরীক্ষায় বসলাম এবং কী আশ্চর্য ইন্টারভিউতেও ডাক পেয়ে গেলাম। ইন্টারভিউতে ডাক পাবার পর অশোককাকাকে জানালাম, অশোককাকা খুব খুশি। বললেন, আই আই এম থেকে পাশ করে বেরোতে পারলে আর চিন্তা নেই, মোটা মাইনের চাকরি বাঁধা। হয়তো, বাবার অবসর গ্রহণের দিন এগিয়ে আসছে, আমাদের মধ্যবিত্ত পরিবারে একটা চাকরির আশু দরকার, এইসব চিন্তা অশোককাকার মনে ছিল।

ইন্টারভিউ দেবার পর আই আই এম-এর ফেলোশিপ প্রোগ্রামে জায়গা পেয়ে গেলাম। ফেলোশিপ প্রোগ্রামের কাঠামো অনুযায়ী প্রথম দু-বছর পিজিডিএম-এর ছাত্রদের সঙ্গে ক্লাস করতে হত। সেই কোর্স-ওয়ার্ক এবং পরীক্ষায় পাশ করলে গবেষণার জন্য সময় পাওয়া যেত আরো বছর দুয়েক। দুর্ভাগ্যবশত, আমি আই আই এম-এ তিন-চার মাস ক্লাস করেই হাঁপিয়ে উঠলাম। অ্যাকাউন্টেন্সি, মার্কেটিং, বিহেভিয়ারাল সায়েন্স— এসব কী পড়তে হচ্ছে, এসব বিষয় জানার উৎসাহ আমার তো কোনো কালেই ছিল না। ঠিক করলাম আই আই এম ছেড়ে দেব। একমাত্র অন্তরায় অশোককাকা কী বলবেন। অনেক ভেবেচিন্তে অশোককাকাকে একটা চিঠি লিখলাম। তাতে, এখন ভাবলে লজ্জা করে, অল্পবয়সের দোষে, কিছু অতিশয়োক্তি ছিল। কিছুদিন পরে কোথাও একটা অশোককাকার সঙ্গে বাবার দেখা হয়। বাড়ি ফিরে বাবা বলল, অশোক তোর ওপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছে।

আই আই এম ছেড়ে দিয়ে প্রথমে কিছুদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অসীম দাশগুপ্তর অধীনে একটা প্রজেক্টে কাজ করলাম, তারপর কয়েক মাস ব্যাঙ্কে। এই সময়টা ভয়ে ভয়ে অশোককাকার সঙ্গে খুব একটা যোগাযোগ রাখিনি। ব্যাঙ্কে কাজ করতে করতে আমেরিকা রচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করার একটা সুযোগ পাই। বিদেশে পড়তে যাবার ব্যাপারে আমাদের পরিবারের কারোরই খুব একটা পরিষ্কার ধারণা ছিল না। তাই আবার অশোককাকার শরণাপন্ন হলাম। অশোককাকা আমাকে সস্নেহে গ্রহণ করলেন।

এর পরের চার-পাঁচ বছর অশোককাকা আমাদের পরিবারের ভরসা, পরামর্শদাতা, মুশকিল-আসান, যা বলা যায় তা-ই। বিদেশযাত্রার আগে হাজার সমস্যা, আর সমস্যা হলেই অশোককাকাকে জিজ্ঞেস করতে হবে। একটা সমস্যার কথা খুব মনে আছে। সে-সময় বিদেশি মুদ্রা কেনা আজকালকার মতো এত সহজ ছিল না। একটা নিয়ম অবশ্য ছিল, এমএ পরীক্ষা প্রথম শ্রেণিতে পাশ করলে কিছু বিদেশি মুদ্রা কেনা যাবে। ভাগ্যক্রমে এমএ-তে একটা ফার্স্ট ক্লাস আমার কপালেও জুটেছিল। সেই ভরসায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ডলার কিনতে গিয়ে দেখি সেখানে তিন মাস ধরে গো স্লো চলছে, কবে আমার

দরখাস্তটা গ্রাহ্য হবে তার কোনো ঠিক নেই। অথচ যাবার দিন এগিয়ে এসেছে, আর যাবার সময় কিছু ডলার হাতে না রাখলেই নয়। শেষে অশোককাকাই তাঁর পুরোনো বন্ধু আই জি প্যাটেলকে বলে ডলার কেনার ব্যবস্থা করে দিলেন। আই জি প্যাটেল তখন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর।

বিদেশ যাবার সাড়ে চার মাসের মধ্যে আমার বাবা মারা যান। সেই সময়টা আমার জীবনের সব থেকে সংকটের সময়। বছর দুই ধরে বাবার শরীরে ক্যানসার বাসা বেঁধেছিল, কিন্তু সেটা ধরা পড়ল একেবারে শেষ দিকে, বাবার মৃত্যুর মাস তিনেক আগে। বাবার শেষ চিকিৎসাটা পিজি হাসপাতালে অশোককাকাই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। বাবা মারা যাবার পর আমি দেশে আসতে পারিনি। সবে গেছি, টিকিট কাটার মতো টাকাপয়সা সঙ্গে নেই, এই অবস্থায় আসাটা শক্ত ছিল। আর, একবার ফিরে এলে টাকাপয়সা জোগাড় করে এবং মানসিক শক্তি সঞ্চয় করে আবার যাওয়াটা আরো শক্ত ছিল। বাবারও শেষ অব্দি চেষ্টা ছিল আমার লেখাপড়ার যেন বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত না ঘটে। তাই নিজের অসুখের কথা বাবা কিছুতেই আমাকে জানাতে দেয়নি। বাবা মারা যাবার পর আমার দেশে না আসার সিদ্ধান্তকে অশোককাকা বিশেষভাবে সমর্থন করেছিলেন। ওই দুর্বল মুহূর্তে অশোককাকার সমর্থন না পেলে আমি বোধহয় লেখাপড়া জলাঞ্জলি দিয়ে চিরতরে দেশেই ফিরে আসতাম। যখন পিএইচডি প্রায় শেষ হয়ে আসছে, এদিক-ওদিক চাকরির সন্ধান করছি, তখনও অশোককাকার পরামর্শ অপরিহার্য ছিল। মনে আছে, এক সন্ধ্যেবেলা আমার মাস্টারমশাই রোনাল্ড জোন্স-এর বাড়িতে জগদীশ ভগবতীর সঙ্গে আলাপ হল। চাকরি খুঁজছি শুনে তিনি বললেন দিল্লির আই সি আর আই ই আর, সংক্ষেপে ইক্রিয়ার, নামক সংস্থায় দরখাস্ত পাঠাতে, তারা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিশেষজ্ঞ অর্থনীতির গবেষক চাইছে। অশোককাকাকে জিজ্ঞেস করলাম। অশোককাকা ইক্রিয়ার-এ চাকরির চেষ্টা করতে বারণ করলেন, লিখলেন সংস্থাটি তাঁর ঘোর অপছন্দের। যদি দেশে ফিরতে চাই যেন ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইন্সটিটিউট এবং ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট কলকাতার এই দুই সংস্থায় দরখাস্ত পাঠিয়ে দিই। অশোককাকার কথামতো দরখাস্ত পাঠালাম, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইন্সটিটিউট-এ চাকরিও হল, যে চাকরি গত তেত্রিশ বছর ধরে করছি।

মার্কিন দেশে মামমুন জামিল বলে একটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। চমৎকার ছেলে, তখন সানি বাফেলোতে পিএইচডি করছে, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইন্সটিটিউট-এর প্রাক্তনী। অশোককাকা মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে মা-র সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। সেরকমই একবার এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, মামমুন জামিল বলে কাউকে চেন? সে তোমাকে চেনে বলেছে। তার সঙ্গে আতাউর রহমান-এর মেয়ের বিয়ের কথা হচ্ছে। আতাউর রহমান নামটার সঙ্গে পরিচয় ছিল। জানতাম তিনি বাবা এবং অশোককাকা দুজনেরই বন্ধু ছিলেন। আমি মামমুনের ভূয়সী প্রশংসা করলাম, বিয়েটাও হয়ে গেল, বিয়েতে যে বিরিয়ানিটা খেয়েছিলাম তার স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে। বিয়ে হয়ে যাবার পরে একদিন আমি মামমুনকে কথায় কথায় বলেছিলাম, জানিস তো, বিয়ের আগে অশোক মিত্র আমার কাছে তোর সম্বন্ধে ভালো করে খোঁজখবর নিয়েছিলেন। মামমুন খুব মজার ছেলে। কোথাও একটা দেখা হবার পর সে অশোককাকাকে বলল, আপনি তো অভিরূপদার কাছে আমার সম্বন্ধে খুব খোঁজ নিয়েছিলেন। মামমুন ভেবেছিল অশোককাকাকে অপ্রস্তুত করে দিলে একটা মজা হবে। কিন্তু অশোককাকাকে অপ্রস্তুত করা অসম্ভব। অশোককাকা বললেন, শুধু অভিরূপ কেন, আরো চার-পাঁচ জায়গায় খোঁজ নিয়েছি। তুমি কী ভেবেছিলে খোঁজটোজ না নিয়েই আমরা মেয়ের বিয়ে দেব?

আর একবার বেশ সকালবেলা অশোককাকার বাড়ি গিয়েছি, কী কাজে মনে নেই। গিয়ে দেখি খাবার টেবিলে বসে এক বৃদ্ধ দুধ-মুড়ি দিয়ে ব্রেকফাস্ট সারছেন। অশোককাকা জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কে জান? আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে অশোককাকা মজার গলায় বললেন, আচ্ছা, বল তো ওঁর বয়েস কত হবে? আড়চোখে দেখলাম বৃদ্ধও মুচকি মুচকি হাসছেন। কেন জানি না, মনে হল, ইনি নিশ্চয় কোনো বর্ষীয়ান অর্থনীতিবিদ। বললাম, ইনি ভবতোষ দত্ত-র সমসাময়িক হবেন। শুনে বৃদ্ধ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, হুঁঃ, ভবতোষ? তাকে তো আমি ঢাকায় পড়িয়েছি। ভবতোষ দত্ত-র থেকে বয়ঃজ্যেষ্ঠ কোনো অর্থনীতিবিদ জীবিত থাকতে পারেন এটা আমার কল্পনার অতীত ছিল। অথচ এই বৃদ্ধ বলছেন ভবতোষ দত্তকে পড়িয়েছেন? আমাকে নিয়ে আর একটু মজা করার পর অশোককাকা বৃদ্ধের পরিচয় দিলেন— অমিয়কুমার দাশগুপ্ত, অশোককাকার মাস্টারমশাই। বিদ্যুৎচমকের মতো আমার মনে পড়ে গেল, অমিয় দাশগুপ্তর ওপর লেখা অজিত দত্ত-র ছড়া— 'ব্যাচেলার অমিদা / যদি কোনও জমিদা-/ রের মেয়েকে বিয়ে করে ফেলেনই / তবে কোন আশাতে / আসিব এ বাসাতে / সেকথা তো কারও মনে খেলেনি?'

অমিয় দাশগুপ্ত মহাশয়ের সান্নিধ্যে সকালটা চমৎকার কেটেছিল। অমিয় দাশগুপ্তর অক্সফোর্ডে তাঁর সহপাঠীদের গল্প করছিলেন। তিন দিকপাল সহপাঠী— নিকোলাস ক্যালডর, রিচার্ড গুডউইন এবং জন হিকস। অমিয় দাশগুপ্ত বলেছিলেন, এঁদের মধ্যে সবথেকে তাড়াতাড়ি চিন্তা করতে পারতেন

গুডউইন যিনি পরবর্তীকালে বামপন্থী হয়ে গিয়ে মূল স্রোতের অর্থনীতি থেকে কিছুটা সরে গিয়েছিলেন। অপরপক্ষে, সব থেকে ধীরে ধীরে চিন্তা করতেন জন হিকস, যিনি নোবেল তো অবশ্যই পেয়েছিলেন, কিন্তু তার থেকেও বড়ো কথা, যিনি পরবর্তীকালে আধুনিক অর্থশাস্ত্রের অন্যতম স্থপতির স্বীকৃতি পেয়েছেন। আর ক্যালডর, কেনসীয় অর্থনীতির ধারক, কেমব্রিজ স্কুলের অন্যতম প্রতিভূ, তাঁর কথা তো ছাত্রজীবন থেকেই শুনে আসছি। অমিয় দাশগুপ্ত মহাশয়ের মুখে এঁদের দৈনন্দিন জীবনের গল্প শুনে রোমাঞ্চ হচ্ছিল।

অশোককাকার মধ্যে কেউ কেউ স্ববিরোধ লক্ষ করেছেন। সম্ভাবনাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অশোককাকা কট্টর বামপন্থী অথচ তাঁর কবিতাভবনের বন্ধুরা— বাবা, নরেশকাকা, নিরুপম চট্টোপাধ্যায়— এবং অবশ্যই কবিতাভবনের মূল আকর্ষণ বুদ্ধদেব বসু, কেউই বামপন্থী ছিলেন না। এঁদের সান্নিধ্যে কেমন করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটাতেন অশোককাকা? ব্যাপারটা এরকম নয় যে যৌবনের উন্মাদনায় সামান্য কিছুদিন তিনি কবিতাকে আঁকড়ে ধরেছিলেন, তারপর জ্ঞানোদয় হবার পর কবিতাকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে তিনি মিছিলে যোগ দিয়েছেন, আর কখনো ফিরে তাকাননি। মানতেই হবে, তিনি সমর সেন ছিলেন না। বস্তুত, কবিতাকে তিনি কদাচ পরিত্যাগ করেননি, পরিণত বয়স পর্যন্ত পরম আগ্রহে কবি-বন্ধুদের সংসর্গ উপভোগ করেছেন। এই তো গত বছরেই ফোন করে বললেন, তোমার বাবার কবিতাসংগ্রহটা নিয়ে একদিন আসবে? আজকাল চোখে দেখতে পাই না, তাই নিজে পড়তে পারি না। তুমি এসে কয়েকটা কবিতা পড়ে শোনালে খুব ভালো লাগবে। সেদিন গিয়ে দেখেছিলাম, সেই বৃদ্ধ বয়সেও কবিতা থেকে কী দারুণ আনন্দ পাবার ক্ষমতা তিনি রাখেন।

কর্মজীবনে প্রবেশ করার পর অশোককাকার সঙ্গে কখনো অর্থনীতি নিয়ে কথা বলিনি। তাই তাঁর বামপন্থী সত্তার নাগাল পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু বার বার তাঁর সমুদ্রের মতো বিশাল মনের পরিচয় পেয়েছি, দেখেছি আশেপাশের মানুষদের জন্য কী অবিশ্রাম ধারায় তাঁর সহানুভূতি বর্ষিত হয়েছে। কয়েক বছর আগে আমার বাবার আরেক ঘনিষ্ঠ বন্ধু নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, যাঁর ছোটো মেয়ে আমার ঘরণী, একটা ভারী অস্ত্রোপচারের পর কিছুদিন আমাদের বাড়িতে ছিলেন। নীরেনকাকাকে দেখতে এলেন অশোককাকা, সেই শেষ আমাদের বাড়িতে অশোককাকার আসা। সেদিন অনেকক্ষণ আড্ডা জমেছিল। কথায় কথায় অশোককাকা রবীন্দ্রনাথের কিশোর বয়সে লেখানদুটো লাইনের উল্লেখ করলেন। যতদূর মনে পড়ছে, লাইনদুটো এইরকম— 'আমার হৃদয়, আমারই হৃদয়, বেচিনি তাহাকে কাহারো কাছে / ভাঙাচোরা হোক, যাহোক তাহোক আমার হৃদয় আমারই আছে।' এখন মনে হয়, কথাগুলো রবীন্দ্রনাথের হলেও, অশোককাকার ক্ষেত্রে ষোলোআনা খাটে। যুগে যুগে যেসব কমরেড পার্টির কাছে হৃদয় বেচে দিয়েছিলেন, আমার সামান্য বিবেচনায়, অশোককাকা তাঁদের কেউ নন।

১ মে ২০১৮

অমিয় দেব

শোক ব্যক্তিগত। অন্তত এখন যে-বয়সে আমি উপনীত তাতে ঘনিষ্ঠ মৃতজনের সামনে দাঁড়িয়েও মন হাহাকার করে ওঠে না, চুপ করে যায়। ছেচল্লিশ বছর আগে ডেভিড ম্যাকাচ্চনকে কবর দেবার সময় যেমন করে সকলের পিছনে দাঁড়িয়ে সত্যজিৎ রায় মাথা উঁচু করে গাছগাছালি ও আকাশ দেখছিলেন, তেমনি? না, ঠিক তা নয়, তাতে বিশ্বসাথে যোগের এক ইচ্ছা ছিল। আবার যুধিষ্ঠির কথিত 'অহনি অহনি'ও নয় বোধ করি, কারণ সমবেত শোকার্থীদের পাশে বসে চায়ের পেয়ালা মুখে তুললেও স্মৃতির একটা টান তো ছিলই— যেমন করে তাঁর আপন কোণে বসে তিনি প্রত্যেকের পেয়ালায় চা ঢেলে দিতেন— তিনি, অশোক মিত্র, আমাদের কারো কারো অশোকদা, যিনি এখন ওই ভিতরের ঘরের মেজেতেই অপার নিস্পন্দতায় শায়িত। মুখে বাক্যস্ফূর্তি হচ্ছে বটে আমার, কিন্তু তাও কি খানিক কথা ঘোরাবার ছলে নয়। কোনো তরুণ বা তরুণীর চোখ একটু সজল দেখলেই কি ঈর্ষাও হচ্ছে না, আহা, কেন ওই বয়সে ফিরতে পারি না! তাঁর সঙ্গে আমার বয়সের তফাত মাত্র ছয়— আগুন বুঝি আমাকে রেহাই দেবে। শোক ব্যক্তিগত, বলে কি এবার আমি আগুন অভিমুখেই যাব না? আহা, সময়কল উলটে চালিয়ে কি অগ্নিসন্নিধ হওয়া যায় না! একদা তো প্রায় সদাগম্যই ছিল ওই চত্বর।

আটত্রিশ বছর আগের কথা। তখন তিনি মন্ত্রী। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু অরুণকুমার সরকার মারা গেছেন। সাবেক কেওড়াতলায় বুঝি কাঠের চুল্লিতেই তিনি দাহ হচ্ছেন। আমরা অনেকে ওপাশে অপেক্ষা করছি। অস্থিরভাবে পদচারণা করতে করতে হঠাৎ আমার সামনে দাঁড়িয়ে অশোকদা তাঁর দুই হাত আমার কাঁধে রেখে বলে উঠলেন, অরুণের কবিতা আমি ইলেকশন ক্যাম্পেনেও ব্যবহার করেছি : 'শুধু প্রেম নয়, কিছু ঘৃণা রেখো মনে'। কী আবেগ তাঁর গলায়। বছরখানেক পরে আমিও পি.জি.-তে মরণাপন্ন হয়েছিলাম, কিন্তু আগুন আমাকে নেয়নি, আমি বেঁচে ফিরে এসেছিলাম। অশোকদা আমায় দেখতে এসেছিলেন। পরে, মন্ত্রী থাকাকালীনই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সংসদের আমন্ত্রণে ক্যাম্পাসে এসেছেন; সুবীর (রায়চৌধুরী) ও আমি তাঁর বক্তৃতা শুনতে গেছি; মন্ত্রী হিসেবে যে তাঁর কাছে কিছু চাইতে আমরা কখনো যাইনি, তা উল্লেখ করে তৃপ্তি জানালেন।

তাঁর এক বন্ধু ছিলেন যাঁর কথা কারো খুব মনে নেই। সুরঞ্জন সরকার। খুব মজাদার মানুষ। গুণী, আবার খ্যাপাটেও। কী সূত্রে জানি না তাঁর সঙ্গে আমারও বেশ চেনা হয়ে গিয়েছিল। 'হলদে প্রজাপতি' নামে এক নিবন্ধে (দ্র. *স্বকাল* কবি অরুণকুমার সরকার সংখ্যা) তাঁর এই দুই বন্ধুকে—অরুণকুমার সরকার ও সুরঞ্জন সরকার—নিয়ে খুব অন্তরঙ্গভাবে লিখেছেন অশোকদা। মনে আছে সুরঞ্জন সরকারের মৃত্যুর পর তাঁর এক স্মরণেরও তিনি আয়োজন করেন তথ্যকেন্দ্রের দোতলায়—বন্ধুবাৎসল্যের জাজ্বল্যমান উদাহরণ।

বস্তুত তাঁর মতো বন্ধুবৎসল ও স্নেহপ্রবণ মানুষ খুব বেশি দেখিনি। যাঁদের তিনি স্নেহ করতেন তাঁদের তিনি স্নেহই করতেন। অরুণকুমার সরকার ছাড়া আর যে-দুই বন্ধুর সঙ্গে তিনি ২০২ রাসবিহারী এভিনিউয়ের কবিতাভবনে একসময় আড্ডা দিতেন—নরেশ গুহ ও নিরুপম চট্টোপাধ্যায়—তাঁদের প্রতি তাঁর অন্তরঙ্গতার সীমা ছিল না। এবং ২০২-এর সঙ্গে যে-সম্পর্ক তিনি পাতিয়েছিলেন তার পুরো লয় বোধহয় কোনোকালেই হয়নি। দূরত্বের কথা তিনি নিজেই বলেছিলেন: অরুণকুমার সরকার ও নরেশ গুহ সম্পাদিত *কলকাতা* বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা ১৯৬৮-তে তিনি কেন লিখতে পারছেন না তা জানিয়ে যে-খোলা চিঠি তিনি নরেশ গুহকে লেখেন নতুন দিল্লি থেকে ('দূরে এসে ভালো থাকি' [প্রতিভাস পুনর্মুদ্রণ, পৃ. ৩৪-৩৮]), তাতে। কিন্তু তাঁর সাহিত্যপ্রেমের শিকড় যে বুদ্ধদেব বসুতেই তাও স্পষ্ট ওই চিঠিতেই। উদ্ধৃতি বড়ো হয়ে যাবে বলে মাত্র কিছু অংশ তুলে ধরছি : 'যতদিন ঢাকা ছিলাম, বুদ্ধদেব-বিভোরতাতেই কেটেছে। ... পরে দুশো দুই নম্বরের বাড়িতে বহু সন্ধ্যা আড্ডা দিয়েছি ... সন্ধ্যা রাত্রি হয়েছে, রাত্রি মধ্যরাত্রি হয়েছে, মধ্যরাত্রি পেরিয়ে আকাশের ফিকে হবার উপক্রম,

অন্যায় আবদারে প্রতিভা বসুকে বিপর্যস্ত করেছি, অজস্র বিনিময়ের প্রহর গেছে সেই সব ...। এই যে আড্ডা, সময়-না-মানা, নিয়ম-না-মানা, ভব্যতা-না-মানা আড্ডা, তাতেও তো প্রথম-থেকে-শেষ পর্যন্ত জায়গা জুড়ে বুদ্ধদেব বসু। ... আমি এখন যে-পৃথিবীতে, তার মানসতা হয়তো বুদ্ধদেবের ন্যক্কার উদ্রেক করবে; বুদ্ধদেবের চিন্তার বর্তমানে যে-পরিমণ্ডল, আমার কাছেও হয়তো তা সমান অস্বস্তিকর। ... পৃথিবীটা হঠাৎ মস্ত বড়ো হয়ে গেছে; তাই আমি, অশোক মিত্র, ছিটকে একদিকে, আমার কৈশোর-স্বপ্নের, প্রথম প্রেমের ঢাকা কুয়াশায় ঢাকা পড়লো, বুদ্ধদেব বসুর জগৎ ভীষণরকম তফাৎ হয়ে গেলো। এই ভয়ঙ্কর ঘটনাপাতে আমি স্তম্ভিত, আমার কণ্ঠ-পর্যন্ত-উঠে-আসা শোকাকুল কান্না। কিন্তু এ-কান্নার কোনো ভাষা নেই।'

কেউ কেউ এরই সম্প্রসারণ দেখেছেন তাঁর 'কবিতা থেকে মিছিলে'-তে। কিন্তু পুরোপুরি সমাজচেতন হয়ে উঠেও যে তিনি কবিতাকে বাদ দেননি, তার তো অনেক প্রমাণই আছে। তাঁর আধুনিক কবিতার সংগ্রহ ঈর্ষণীয়। সেই সঙ্গে ঈর্ষণীয় তাঁর কবিতা পড়ার স্মৃতিও। কয়েক বছর আগেই তো *কবিতা* পত্রিকা থেকে তাঁর প্রিয় কবিতার এক সংকলনও করে দিলেন। তাছাড়া *গীতবিতান* তাঁর অতিপ্রিয় কাব্যগ্রন্থ। এমন মনোযোগী রবীন্দ্রসংগীত শ্রোতা সচরাচর হয় না। একাত্তরেই বোধহয়, নাকি পরে, তাঁর দরজায় একবার ঘন্টি দিয়েছি—তখন আগে ফোন করে কারো বাড়ি যাওয়ার রীতি খুব একটা ছিল না—দরজা খোলা হলে দেখি তিনি ঠোঁটে আঙুল দিয়ে নিঃশব্দে ঢুকতে ইঙ্গিত করলেন। তখন ভিতরের ঘরে কেউ রবীন্দ্রসংগীত গাইছেন। পরে জানলাম সেই গায়ক তাঁর এক বাংলাদেশী বন্ধু, তাঁর অতিথি। গাইছেন এক ছোটো হারমোনিয়ম বাজিয়ে।

তাঁর পছন্দ-অপছন্দ খুব স্পষ্ট ছিল। যাঁদের অপছন্দ করতেন তাঁদের অপছন্দই করতেন, কোনো রাখঢাক তাতে ছিল না। যেমন সাম্প্রতিক কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার দুয়েরই সমালোচনায় তিনি মুখর ছিলেন। উদারতার কোনো অবকাশ ছিল না তাতে। আবার তাঁর আদর্শ বামপন্থা থেকে বামেদের কোনো বিচ্যুতি তিনি সইতে পারতেন না। এই সবই তাঁর পাক্ষিক পত্রিকা যার বয়স এখন ছয় চলছে, সেই *আরেক রকম*-এ লেখা তাঁর সম্পাদকীয়গুলিতে প্রভূতভাবে প্রতিফলিত। তাঁর স্বাক্ষরিত কিছু লেখাও সেই সাক্ষ্য দেবে। আমার বিশেষভাবে মনে পড়ছে তাঁর শেষ স্বাক্ষরিত লেখার কথা, 'স্মৃতি-বিস্মৃতি : একই অঙ্গে দুই কাহিনি' (১-১৫ এপ্রিল ২০১৮)। আগাগোড়া অশোক মিত্র। তুমি তাঁর সঙ্গে সর্বত্র একমত হও না বা না হও, তাঁর গদ্যের এমনই গুণ যে তোমাকে একটানে পড়ে যেতে হবে। আর তাঁর অন্তিম বিবরণের অন্তর্গত শুভবোধ ও তজ্জাত আবেগকে মূল্য দিতে হবে তোমাকে : 'পুরোটাই প্রহসনে পরিণত হল, আমার একটি প্রস্তাবও গ্রহণ করা হল না। তাঁদের প্রতিবেদনে লেখা হল যে, যে হারে বিলাসী জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার সম্ভাব্য ক্ষতিপূরণের কথা বলা হচ্ছে, তা সম্ভব নয়। সেরকম কিছু করতে গেলে দেশ থেকে বিদেশি মূলধন দ্রুত পালিয়ে যাবে, এবং দেশের মধ্যেও যাঁরা ব্যাবসা-বাণিজ্য করছেন তাঁদেরও তথৈবচ অবস্থায় পড়তে হবে। তা ছাড়া অন্য সমস্যাও আছে। গরিবদের শূন্য হারে ঋণ দেওয়া শুরু হলে অনেক বড়োলোক, নিজেদের কিছু গরিব লোককে ডেকে তাদের একটু বাড়তি পয়সা দিয়ে তাদের মারফত ঋণ পেতে শুরু করবে ইত্যাদি ইত্যাদি। কাহিনিটি বললাম যদিও ইন্দিরা গান্ধীর বাংলা বিজয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ভোটযুদ্ধে গোটা ভারত বিজয় সমস্ত পরিস্থিতিকে ওলটপালট করে দিল, তবু ভাবতে ভালো লাগে, একসময় আমরা স্বপ্ন দেখতাম এবং ভাবতাম স্বপ্নকেও জীবনে সফল করা যায়।'

এই *আরেক রকম* পত্রিকা নিয়েও আমার মার্জনা চাওয়া হল না অশোকদার কাছে। তাঁর বয়সে নিয়মিত পাক্ষিক বের করার ধকল তিনি নিতে পারবেন কিনা তা নিয়ে আমার গোড়ায় সন্দেহ ছিল। তা যে অমূলক তা প্রমাণ হয়েছে। এমনকী আমার মতো প্রত্যক্ষ রাজনীতিহীনের ইতিউতি লেখারও তিনি জায়গা দিয়েছেন। এতেও তাঁর স্নেহেরই প্রশ্রয় ছিল। সেই স্মৃতি অম্লান থাক।

স্নেহের দায়বদ্ধতা এবং একটি মানুষ

নবনীতা দেব সেন

অশোকদাকে নিয়ে লেখবার যোগ্যতা আমার নেই। খুব ভালোবেসেছি, খুব স্নেহ পেয়েছি, অনেক দিয়েছেন জীবনভর। কিছুই দিয়ে উঠতে পারিনি তার বদলে। আমাদের বিয়েটা যখন ভেঙে গেল, হিথরো থেকে দিল্লি এয়ারপোর্টে দুই শিশু আর দুই সুটকেস নিয়ে এসে নামলুম, তখন আমাকে নিয়ে যেতে অশোকদা ছিলেন এয়ারপোর্টে। আমার নন্দাই দীপেনও এসেছিলেন আমাকে নিতে। দুজনেই বিধ্বস্ত। আমাদের সকলেরই জীবনে সেই প্রথম এমনধারা বিচ্ছেদের অভিজ্ঞতা। এমনটি যে হতে পারে তা ওঁরাও কল্পনা করেননি তখনকার দিনে। সেদিন আমি ভেবেচিন্তেই মনের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করেছিলুম। অশোকদার সঙ্গে বাড়ি না গিয়ে দীপেনের সঙ্গে গিয়েছিলুম। তখন আমার মনে হয়েছিল, দীপেনের সঙ্গে না গেলে বুঝি এই মুহূর্ত থেকেই আমার মনস্থির করা, জীবনের পথ বেছে নেওয়া হয়ে যাবে। অশোকদা বাপের বাড়ি। দীপেন শ্বশুরবাড়ি। এই মুহূর্ত, একটা নির্বাচনের মুহূর্ত। শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক বুঝি ছিন্ন হয়ে যাবে অশোকদার সঙ্গে চলে গেলে, তার চেয়ে ননদের কাছেই যাই। আমি তো চাইনি সম্পর্ক মুছে যাক। অশোকদা দুঃখ পেলেন কিনা জানতে পারিনি, গৌরীদি এটাকে সুচিন্তিত সিদ্ধান্তই মনে করেছিলেন। সেই দিনটি থেকে শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে আমার সম্পর্ক আর আপন স্রোতে আজ অবধি বহমান। স্বামীর ঘরের বাইরেও তো আমাদের দেশের শ্বশুরবাড়ি অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু সেদিন, সেই একাকিত্বের প্রথম মুহূর্ত থেকেই আমি জানতুম আমার পায়ের নীচে একটা শক্ত মাটি আছে। বাবা নেই, শ্বশুরমশাই নেই, দুজনে একইসঙ্গে তিন সপ্তাহের মধ্যে মারা গিয়েছেন। কিন্তু আমার দাঁড়াবার ঠাঁই আছে। বাপের বাড়ির মাটি। ১ মে ২০১৮ অবধি তার হেলদোল হয়নি।

তার অনেকদিন আগে, আমি তখন কলকাতায়। অমর্ত্য বিদেশে কোথাও। আমার ছোটো মেয়ে টুম্পা তখনও জন্মায়নি, তিন বছরের পিকোর খুব জ্বর, টাইফয়েড ধরা পড়েছে। একদিন সকালে আমার শ্বশুরমশাই শাশুড়িমা কলকাতায় এসে আমাকে খুব বকছেন, আমার অযত্নে, অবহেলাতেই তাঁদের নাতনি অসুস্থ। তাঁরা ওকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে যাবেন। সেখানে ভালো সেবা-শুশ্রূষা হবে। আমি এই অদ্ভুত কথায় মত দিতে পারছি না বলে তাঁরা আমাকে খুব বকছেন। অমর্ত্য বিদেশে, মা-বাবা এসবের মধ্যে কখনোই ঢুকবেন না। আমার পক্ষে এই জ্বরো মেয়েকে, টাইফয়েড জানতে পারার পর, হঠাৎ শান্তিনিকেতনে নিয়ে যেতে দেবার প্রশ্নই ওঠে না। আমি তর্ক করতে করতে এঁটে উঠতে না পেরে কেঁদে ফেলেছি।

এমন সময়ে ঘরে ঢুকলেন অশোকদা, পিছনে গৌরীদি। অশোকদা এসেই বিনা ভূমিকায় বললেন, 'আমরা কিছুক্ষণ হল এসেছি। বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম। ঘরে ঢুকব কিনা ভাবছিলাম, কিন্তু এখন মনে হল ঢুকে পড়াই উচিত। মেয়েটার অসুখ এখন কোথাও নেবার প্রশ্ন ওঠে না। সেরে উঠুক তার পরে নিয়ে যাবেন।'

এর পরে আমার শ্বশুরমশাই আর শাশুড়িমা আর কিছু বললেন না। গৌরীদি তাঁর রুমালটা আমাকে এগিয়ে দিলেন। দিনটা আমায় ছবির মতো চোখে কানে মনে স্পর্শ করে আছে। খুব কঠিন মুহূর্তে দেবদূতের মতো এসে পড়ে অশোকদা উদ্ধার করেছিলেন আমাকে।

এই পিকোকে অশোকদা খুব খ্যাপাতেন, তাঁকে বলতেন, 'তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে-টা বলো তো শুনি?'

পিকো যেই বলত 'উঁকি মারে আকাশে' অশোকদা হাঁ-হাঁ করে বলে উঠতেন 'না না, ঘুঁষি মারে আকাশে!' পিকো বলত 'ঘুঁষি না, উঁকি', অশোকদা বলতেন, 'উঁকি না, ঘুঁষি।' এইরকম চলত।

দিল্লিতে যখন তিনি শান নগরে থাকেন মস্ত বাগানওলা বাংলোবাড়িতে, মাসিমা ছেলের কাছে দিল্লিতে গিয়েছিলেন, কর্মসূত্রে। যখন ফিরতেন অফিস থেকে, ড্রাইভার সেলাম করে গাড়ির দরজা খুলে দিত, মাসিমা নামতেন আর পিছনে পিছনে তাঁর বেয়ারা নামত ইয়াব্বড়ো ফাইলের গাদা নিয়ে। এমন মা মাসি আমি আগে দেখিনি। একেবারেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলুম, একদম চিরদিনের মতো ফ্যান বনে গেলুম মাসিমার। দিল্লিতে অশোক রোডে আমার শ্বশুরমশাইকে দেখতুম অফিস থেকে

ফিরতেন ক্লান্ত হয়ে, আর ফাইলের পাহাড় নিয়ে পিছু পিছু বেয়ারা আসত। দেখে বেচারা বেয়ারার ওপরেই রাগ হয়ে যেত, 'আফিসের কাজ বাড়িতে এনে ফেলা? ছিঃ ছিঃ।' তাঁর আগে এরকম ফাইল বইতে আর কাউকে দেখিনি? আমাদের ঘনিষ্ঠ মানুষদের মধ্যে সরকারি চাকুরে তো ছিলেন না।

মাসিমাকে আমি কলকাতায় অশোকদার হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে দেখেছি প্রথম, তাঁর গৌরবর্ণ দীর্ঘদেহী স্বামীর সঙ্গে সংসার করতে। মেসোমশাই ছিলেন তখন। আটপৌরে করে শাড়ি পরে আঁচলে চাবি বেঁধে বাড়িতে ঘুরে-ফিরে সংসার করতে দেখেছি মাসিমাকে। তখনও হয়তো অফিসে যেতেন, সেটা চাক্ষুষ দেখিনি। দাদা বাইরে থাকতেন, খুকু দুই বিনুনি দুলিয়ে পড়তে যেত। তাঁর এমন ফাইলমোহিনী মুরতি দেখব কল্পনাতেও ছিল না। খুব ভালো লেগেছিল। তখন আমি দিল্লিতে গৃহিণীপনা করি। একটু একটু হিংসেও কি হয়নি? প্রসঙ্গত, সেই খুকুরও গিন্নিবান্নি মূর্তি দেখছি এখন। সময় ম্যাজিক জানে।

অশোকদার নানান দলের আড্ডা ছিল। রোববার সকালে বিভিন্ন দলের বন্ধুদের (ও ভক্তদের) নিয়ে তিনি চা-জলখাবারের আড্ডা বসাতেন। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষদের দেখেছি সেখানে। তাঁর তো মস্ত বড়ো জগৎ, অর্থনীতি, সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি সব পাড়ার মানুষের আড্ডা হত সেখানে। অশোকদার পড়ার ঘরের মেঝে থেকে ছাদ অবধি ঠাসা বই-এর মধ্যে কী নেই? সাহিত্য, শিল্প, অর্থনীতি, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, ধর্ম, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সংগীত পর্যন্ত। কাজেই তাঁর আড্ডা দেবার মানুষদের বৈচিত্র্যও আন্দাজ করা কঠিন নয়।

হিতেন ভায়া, স্নেহাংশু আচার্য, অশোকদা, ওঁদের একটি আলিপুরের আড্ডাবাজ বন্ধুর দল ছিল। আমার বিয়ে ভাঙার সময়ে স্নেহাংশু আচার্যের কাছে আইনি উপদেশ নিতে গিয়েছিলেন অশোকদা আর হিতেন। আমি কারুক কোনো উপদেশই শুনিনি, নিজের মতে চলেছিলুম। অশোকদার মাধ্যমেই হিতেনের সঙ্গে আমার আলাপ। হিতেনের স্ত্রী আঞ্জু গৌরীদির খুব বন্ধু ছিলেন আমাদেরও ভারি ভাবসাব হয়ে গেল। আঞ্জু গোয়ার মেয়ে, দারুণ গোয়ান রান্না করে আমাদের খাওয়াতেন। অশোকদার কল্যাণেই তাঁদের সঙ্গে পরিচয় এবং বন্ধুত্ব আমার। অশোকদা গৌরীদির সঙ্গে হিতেনদের ঘনিষ্ঠতা পারিবারিক সম্পর্কের পর্যায়ে পৌঁছেছিল। তাঁদের ছেলে-মেয়েদের অশোকদা সন্তান-স্নেহ করতেন। তবে, এটা অশোকদার ম্যাজিক। চারিদিকে কতজন যে আত্মীয় তৈরি করে গিয়েছেন! সব বন্ধুর সন্তানই তাঁর সন্তান তুল্য ছিল। তাঁর বই-এর তাকে তাদের ছবি থাকত। অদিতি, জয়তী, পিকো, টুম্পা, মুন্নি, বুড়ো, জ্যাকি, মানিক, মুকুল, আরো অনেক বাচ্চা তাঁর। অশোকদার ছিল সত্যি সত্যি বসুধৈব কুটুম্বকম। চোখ বুজলেই তো মনে পড়ে অ্যালিসের কথা। আমৃত্যু অ্যালিস থর্নার নিয়ম করে বছরে একবার ভারতে আসতেন প্যারিস থেকে, কলকাতায় তাঁর ঠিকানা ছিল ফ্ল্যাট ৩, সোনালি এস্টেট। বছরে একাধিক বার নুরজাহান বোস ওয়াশিংটন থেকে, কিম্বা ঢাকা থেকে কলকাতায় আসেন। অশোকদার বাড়ি তাঁরও ঠিকানা। বরোদা থেকে বিবি (অলকনন্দা প্যাটেল) কলকাতায় এলে আমরা অশোকদার কাছে খবর পাই। দিল্লি থেকে অদিতি, জয়তী যখন কলকাতায় আসেন, অশোকদার কাছে থাকেন। হিতেনের মেয়ে মুন্নিও। আরো অগুনতি সদস্য অশোকদার সংসারের। কত নাম বলব? আমাদের পরিবার কি ছোটো? আমরা এখন গভীর অশৌচ আক্রান্ত।

হিতেনের স্ত্রী আঞ্জুও গৌরীদির মতোই অকালে চলে গিয়েছেন। লিখতে বসে মনে হচ্ছে আমাদের মহা সৌভাগ্য হিতেন এখনও আমাদের মধ্যে আছেন, সজীব, সকর্মক। অশোকদা চলে যেতে, হিতেন আমাকে এই মেইলটি করেছেন ৩রা মে ২০১৮।

প্রিয় নবনীতা,

looking at old numbers of আরেক রকম, I came across an article by you অশোকদা শ্রীচরণেষু...। thought of writing to অশোক, but strangely I chanced upon this terrible news, when you were probably walking to কেওড়াতলা।

এবারে আমার পালা।

'সবারে আমি প্রণাম করে যাই।
অনেকদিন ছিলাম প্রতিবেশী
দিয়েছি যত নিয়েছি তার বেশি।'

ইতি হিতেন (ভায়া)

মন খারাপ হয়ে গেল, হিতেন সত্যি এখনও স্বাবলম্বী, প্রাণবন্ত, কর্মক্ষম রয়েছেন। নিজের ই-মেইল নিজেই করেন, নব্বই পেরিয়েছেন তিনি আগেই। মেয়ে জামাই নাতির সঙ্গে থাকেন। একক নন, নিঃসঙ্গ নন। নিয়মিত মনন-চর্চা করেন। ভয় করছে, অশোকদার চলে যাওয়া তাঁর মন না ভেঙে দেয়। বেঁচে থাকা না-থাকা এক এক সময়ে এক এক বয়েসে মনের ওপরে অনেকখানি নির্ভর করে তো? হিতেনের পত্রে আমার মনটা খুব খারাপ। আমি চাই হিতেন তুমি বেঁচে থাকো। আর তোমার-আমার স্মৃতির মধ্যে আমাদের অশোকদা জীবিত থাকুন।

গৌরীদির মৃত্যুর পরে অশোকদা আদর করে গৌরীদির প্রিয় একটি শাড়ি আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন খুকুর হাতে।

এখন কিছু পাওয়ার রইল না।

৮.৫.১৮

ভাল-বাসা

একটি যুগের স্মৃতি

সুপ্রিয়া চৌধুরী

যাঁরা আমদের খুব কাছের মানুষ, তাঁদের সম্বন্ধে কিছু লেখা অত্যন্ত কঠিন। অশোক মিত্র— আমাদের অশোককাকা-কে নিয়ে লিখতে গিয়ে একটি বিশেষ কারণে নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়। গত কয়েক বছর ধরে বহুবার অশোককাকা আমাকে 'আরেক রকম' পত্রিকায় লেখা দিতে বলেছিলেন। নানা ব্যস্ততার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে আমি তাঁর এই অনুরোধ প্রথম একবারের পর আর রাখতে পারিনি। তিনি আমার কাছ থেকে যে ধরনের লেখা প্রত্যাশা করেছিলেন— সমাজ, সাহিত্য, শিক্ষা বিষয়ক রচনা— আজকের এই স্মৃতিচারণ আদৌ সেই লেখা নয়। তাই লিখতে বসে মনে হয় তাঁর কথা রাখতে পারলাম না, কেবল নিজের মনকে খানিক সান্ত্বনা দেবার জন্যই কলম ধরা।

অশোক মিত্রের সঙ্গে আমাদের পারিবারিক সান্নিধ্যের সূত্রপাত আমার জন্মের বহু আগে, ঢাকা শহরে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি আমার ছোটোমাসি শান্তির সহপাঠী ছিলেন, আমার মা সুশীলা (বিয়ের পরে সুস্মিতা) ও ছোটোমাসির সঙ্গে তাঁর ছিল বিশেষ পরিচয় ও বন্ধুত্ব। বড়োমাসি বিজয়ার সঙ্গে হয়তো তখনও পরিচয়ের সুযোগ ঘটেনি। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রসন্নকুমার জুন্নরকরের এই দুই কন্যা এবং পরবর্তীকালে তাঁদের পরিবারের সকলের সঙ্গে তাঁর যে একান্ত প্রীতি, শ্রদ্ধা ও স্নেহের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তার উল্লেখ আমরা পাই 'আপিলা চাপিলা'-তে। ছোটোমাসির কথা লিখতে গিয়ে তিনি বলছেন: 'শান্তির সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব অচ্ছেদ্যবন্ধনে বাঁধা, আমার সমস্যার সে শরিক, তাঁর সমস্যার আমি।' দেশভাগের পর ছোটোমাসি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পড়াশোনা শেষ করেন। অশোককাকাকে চলে যেতে হয়েছিল কাশীর বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে, আমার মা সুশীলা তখন সেখানে অধ্যাপক অমিয়কুমার দাশগুপ্তের বাড়িতে থেকে অধ্যাপক সুশীলকুমার দে-র কাছে গবেষণার কাজ শুরু করেছেন। পরে মা-ও অন্যত্র চাকরি নিয়ে চলে যান, অশোককাকা কাশীর পাট শেষ করে দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিক্স-এ গবেষকের পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু অশোক মিত্রের বিরাট গুণ যে এই প্রীতির সম্পর্কগুলিকে কোনোদিন তিনি শিথিল হতে দেননি, বরং আরও অনেক আত্মীয় পরিজনকে টেনে নিয়েছেন তাঁর স্নেহময় পরিমণ্ডলে। আমরা ছেলেমেয়েরা তাঁকে জন্মাবধি আমাদের খুব কাছের 'অশোককাকা' বলে চিনি— প্রথমে দিল্লিতে, পরে কলকাতায়। আমাদের বাড়িতে তাঁর ছিল নিত্য যাতায়াত, আমার বাবা অমলেন্দু দাশগুপ্তের সঙ্গে চলত গল্প আড্ডা তর্কাতর্কি; ছোটোপিসি বিজয়া ও পিসেমশাই শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেও বিশেষ বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। বাবা, মা, মাসিরা আগেই চলে গেছেন আমাদের ছেড়ে— প্রত্যেকটি বিয়োগের মুহূর্তে অশোককাকা ছিলেন আমাদের পাশে। আমার মায়ের মৃত্যুর পর পরিবারের একান্ত আপন কয়েক জনকে নিয়ে বাড়িতে একটি স্মরণসভার আয়োজন হয়েছিল, সেখানে অশোককাকা নিজের অসুস্থতা উপেক্ষা করে অনেকক্ষণ বসেছিলেন, এবং মা-র সম্পর্কে যে কয়েকটি কথা বলেছিলেন তা যেমন জরুরি তেমনই তীক্ষ্ণ ও হৃদয়স্পর্শী, কোনোদিন ভুলতে পারব না। বুঝেছিলাম, অশোককাকা কত গভীর অর্থে নারীবাদী, কীভাবে তিনি দীর্ঘ সত্তর বছরের পরিচয়ে সেই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধায় অনড় থেকেছেন।

স্মৃতিচারণ করতে গেলে অনেক কথাই মনে পড়ে, কিন্তু কেবল স্মৃতিচারণ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। অনেকেই লিখেছেন, অশোক মিত্রের চলে যাওয়ায় একটি যুগের অবসান ঘটল। কথাটা ঠিক, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে সেই যুগটাকে যাচাই করা বা মনে রাখার ক্ষমতাও আমরা হারিয়ে ফেলেছি। অশোক মিত্র ও তাঁর সতীর্থরা জন্মেছিলেন পরাধীন ভারতে, স্বাধীনতার প্রাক্কালে। ছেলেবেলা থেকে তাঁদের মনের মধ্যে যেমন দেশের প্রতি ভালবাসা তৈরি হয়েছিল, তেমনই তৈরি হয়েছিল রাজনৈতিক চেতনা। চারিদিকে তাঁরা অনুভব করেছেন সামাজিক অনৈক্য, সাধারণ মানুষের উপর আর্থিক অনটন ও অশিক্ষার প্রচণ্ড বোঝা। সকলেই যে রাজনীতির পথ বেছে নিয়েছিলেন তা নয়। বরং সবচেয়ে মেধাবী যারা— অশোক মিত্র তাঁদের একজন— দেশ গড়ার কথা মাথায় রেখে

লেখাপড়া, সাহিত্য, শিল্প, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় মন দিয়েছেন, শিক্ষকতা বা অন্যান্য পেশায় নিজেদের নিযুক্ত করেছেন। সকলের মধ্যেই ছিল অসম্ভব একাগ্রতা ও এক ধরনের নীতিবোধ, যা তাঁদের জীবনের সবচেয়ে কঠিন সিদ্ধান্তের সময় স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে। সেই যুগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দের কথা ভাবি: তাঁদের নামি-অনামি ছাত্রদের কথা মনে পড়ে, ভারতবর্ষের গ্রাম-গঞ্জ, ছোটো-বড়ো শহরের কত অসংখ্য নারী-পুরুষের আত্মত্যাগ ও একনিষ্ঠ কর্মজীবনের কথা চিন্তা করি। এর মধ্যে ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিল, আবার শিল্পী সাহিত্যিকদের জীবনে এক ধরনের খামখেয়ালি বা বেপরোয়া ভাবও দেখা যেত— যেমন বাবার ও অশোক মিত্রের অগ্রজপ্রতিম সুহৃদ ও পরম শ্রদ্ধাভাজন কবি সমর সেনের মধ্যে লক্ষ করি। কিন্তু মূল কথা একটাই— ওই প্রজন্মের যে মানুষদের খুব কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে, তাঁদের মধ্যে দেখেছি এই কঠোর নীতিবোধ, যার তাগিদে তাঁরা প্রয়োজনে অনেক কিছু ত্যাগ করতে পারেন, আবার কড়া কথা শোনাতে পারেন, আমাদের ভুল ধরিয়ে দিতে পারেন।

অর্থনীতিবিদ অশোক মিত্রের পাণ্ডিত্য ছিল অপরিসীম: তিনি পৃথিবীর নানা স্থানে উচ্চপদাধিকারী ছিলেন, চাইলে বিদেশে বা স্বদেশে 'বড়ো চাকরি' করে দিন কাটাতে পারতেন। তিনি যে সেটা করলেন না, এককথায় বাহাত্তর সালে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টার পদে ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় চলে এলেন, আবার সাতাত্তর সালে বামফ্রন্ট সরকারের অর্থমন্ত্রী হলেন, পরে সাতাশি সালে সরকার ছাড়লেন— সবের মধ্যেই কাজ করেছে নিজস্ব মূল্যবোধ ও নীতিবোধ। অন্যায়ের সঙ্গে কোনোদিন আপোশ করেননি। মতাদর্শের দিক থেকে মার্কসবাদী হলেও তিনি কোনোদিন পেশাদার রাজনীতি করেননি— অথচ যখন ডাক এল তিনি সেই ঝুঁকি নিলেন। রাজ্যের পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য যদি কিছু করা যায়, এই ভেবে হয়তো এগিয়ে গিয়েছিলেন— সেই সময়কার তাঁর বিখ্যাত উক্তি, 'আমি ভদ্রলোক নই, আমি কম্যুনিস্ট'। যখন বাধ্য হয়ে সরকার ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন, তখনও তিনি মতাদর্শে ও নৈতিক চেতনায় অটল— বরং সরকারই টলে গেছে। শেষ জীবন পর্যন্ত তাঁর কথায়, লেখায়, পত্রিকা সম্পাদনায়, যেমন প্রকাশ পেয়েছে তাঁর পাণ্ডিত্য ও ক্ষুরধার বুদ্ধি, তেমনই দেখা গেছে তাঁর স্বাধীনচেতা ব্যক্তিত্ব, সাহিত্য ও সংগীতের প্রতি তাঁর অনুরাগ, এবং অসামান্য কৌতুকবোধ।

ষাট ও সত্তরের দশকে আমরা ছোটো ছিলাম, স্কুলে কলেজে পড়ি। সময়টা ছিল উত্তাল: প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে না পড়লেও, দেশে যা ঘটছে সে সম্বন্ধে উদাসীন বা নিরপেক্ষ থাকা অসম্ভব ছিল। আমার মনে হয়, এই সময়— হয়তো পুরোপুরি না বুঝেই— অশোক মিত্রের কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু শিখেছি। শিখেছি দু-ভাবে। প্রথমত, সমাজ, রাজনীতি, মূল্যবোধ সম্পর্কে ভাবতে হয়েছে, আমার বাবার ও অশোককাকার দীর্ঘ তর্ক ও মতানৈক্যের থেকে চিন্তার খোরাক পেয়েছি। একসময় আমার দাদা তাঁর কাছে নিয়মিত যেত অর্থনীতি বুঝতে। দ্বিতীয়ত, অশোককাকার ব্যক্তিজীবন ছিল আমাদের কাছে অদ্ভুত সততা ও স্নেহ-মমতার প্রতীক। আমরা এবং আমাদের মাসতুতো বোনেরা অশোককাকা ও গৌরীকাকিমার কাছ থেকে পেয়েছি অফুরন্ত আদর ও ভালোবাসা। তাঁদের ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িতে বা আলিপুরের ফ্ল্যাট-এ যখন যেতাম, আমরা একইসঙ্গে পেতাম সমবয়সির মর্যাদা ও সন্তানসুলভ আদরযত্ন। ছোটোবেলায় আমরা সকলে খুব রোগা ছিলাম— অশোককাকা তাঁর ওজনের যন্ত্রে গম্ভীরভাবে আমাদের ওজন মাপতেন, তারপর গৌরীকাকিমা আমাদের খাওয়াতেন। গৌরীকাকিমা চলে যাবার পরও সেইভাবেই খাবার পরিবেশন করা হত ওই বাড়িতে। ১০ই এপ্রিল, অশোককাকার নব্বই বছরের জন্মদিনে, আমি আর আমার ভ্রাতৃবধূ অদিতি— যাকে অশোককাকা বিশেষ স্নেহ করতেন— তাঁকে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলাম। হঠাৎ তিনি ব্যস্ত হয়ে আমাদের জন্য চায়ের পেয়ালার খোঁজ করতে লাগলেন— বাড়িতে থাকলে, গৌরীকাকিমা থাকলে, যেমন করতেন। হাসপাতালে যতদিন কথা বলতে পেরেছেন, আমাদের ছোটোবেলার মজার গল্প, বাবা-মা-র কথা, ঢাকার কথা, আমাকে ও আমার ভাইদের বলে গেছেন। একটা যুগের স্মৃতিও তিনি ধরে রেখেছিলেন, বলার আর কেউ রইল না।

শিকড়ের প্রতি যত্নশীল

যশোধরা রায়চৌধুরী

সকাল থেকে ফোনে ভেসে আসছে মে দিবস নিয়ে নানা রসিকতা। আন্তর্জাতিক শ্রমদিবস এখন মাংস-ভাত খাওয়ার ছুটির দিন বই কিছু নয়। তার ভেতরেই খবরটা এল। ডক্টর অশোক মিত্র আর নেই। দুর্নিবার কমিউনিস্ট যিনি ভেতরে ভেতরে এখনও পোষণ করতেন আপোশহীন কমিউনিস্ট ভাবনা, নবতিপর হয়েও সপাটে কাজ করে চলেছিলেন, নানা লেখালেখির পাশাপাশি সম্পাদনা করে 'আরেক রকম' পত্রিকাটি বের করছিলেন শুধু বিকল্পের চিন্তা থেকেই। ভালো-মন্দ, সাফল্য- বিফলতার ঊর্ধ্বে, কমিউনিজম বিলুপ্তির এই সময়ে সাচ্চা মানুষের অপসারণ, বয়সোচিত হলেও, বেদনার। এসব খবরে, আজকাল, কেবলই ধ্বস্ত লাগে।

একইসঙ্গে এ আমার খুব ব্যক্তিগত ক্ষতি। কেন, তা পরে বলছি।

মোটামুটি সবাই জানেন অশোক মিত্র ছিলেন অর্থনীতিবিদ, এবং ১৯৭০-৭২ সালে ছিলেন দিল্লিতে ইন্দিরা সরকারের চিফ ইকনমিক অ্যাডভাইজার পদে বৃত। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক-এ যান সে সূত্রেই। ক্যাপিটালিজমের ভেতরের কলকবজা স্বচক্ষে দেখে আসেন সেই দশকেই। আর ১৯৭৭-এ জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রী হবার সময়ে অর্থমন্ত্রী হন এবং ১৯৮৭ অব্দি সেই পদে থাকেন। শ্রুত আছে, ১৯৮৭-তেই জ্যোতি বসুর সঙ্গে মতানৈক্যের ফলেই পদটি ছেড়েছিলেন স্বেচ্ছায়। মার্কসিস্ট রাজনীতিক ও অর্থনীতিবিদ এই পরিচয় ছাড়াও তাঁর লেখক পরিচয়ও অনেকের জানা। বাংলা সাহিত্যে অবদানের জন্য সাহিত্য আকাদেমি পেয়েছেন অশোক মিত্র। অসম্ভব প্রাণবন্ত ও স্বাদু গদ্য লিখেছেন। কবিতাও লিখেছেন। কবিতা থেকে মিছিলে, বা *আপিলা চাপিলা*-র মতো বিখ্যাত বই যেমন তাঁর, তেমনই অসংখ্য ইংরেজি বইয়েরও লেখক তিনি। এইসব তথ্যগুলিই অবশ্য গুগ্‌ল করলে পাওয়া যায়। আর আমার চেয়ে ঢের বেশি যোগ্য মানুষ এগুলি নিয়ে লিখবেন আশা রাখি। (শুধু বলে রাখি সমনামি, আইসিএস অশোক মিত্রের সঙ্গে অনেকে মার্কসবাদী অশোক মিত্রকে গুলিয়ে ফেলেন।)

আরেক রকম কাগজটি বেরই করেছিলেন অশোক মিত্র বাম জমানার শেষাশেষি, শুধু অন্যরকম, অলটারনেটিভ, একটা কথা বলার স্পেস তৈরি করতে। এই স্পেসটা ওঁর কাছে যেন শ্বাস-প্রশ্বাসের একটা অক্সিজেন, আমার মনে হয়েছে। কেননা চারিদিক থেকে ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে আসছে তখন বামনীতি, বাম আদর্শের সবরকম কথা। যে তীক্ষ্ণ কান ফাটানো অথচ চাপা, আওয়াজ বাজতে শুরু করেছিল নয়ের দশকে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের পতনে বা লেনিনের একের পর এক মূর্তি ভূলুণ্ঠিত হওয়াতে, সেই ভয়ানক ঢেউ কিন্তু পশ্চিমবঙ্গকেও ছুঁয়েছে ২০০৬ থেকে শুরু করে ২০১১ অব্দি। তারপর তো সেই বিখ্যাত ৩৪ বছরের জমানা বদল, সব রকমের কমিউনিস্ট বা বাম ভাবধারাকে প্রশ্ন করে, তাচ্ছিল্য করে, ছুঁড়ে ফেলার দিন।

অশোক মিত্র মন্ত্রিসভায় ছিলেন একদা। অর্থমন্ত্রী হিসেবে। তারপর তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে দূরে থাকলেও ক্রমাগত নিজের লেখালেখির মধ্যে দিয়ে ব্যাপৃত ছিলেন বাম আদর্শ নিয়ে কথা বলায়। টেলিগ্রাফ বা আনন্দবাজারে সেই সব ক্ষুরধার লেখা আমরা পড়তাম। একইসঙ্গে কবিতার পাঠক হিসেবে তিনি ছিলেন অনন্য। নানা ধরনের পড়াশুনোর ভেতরে জীবন্ত ঝকঝকে এক মেধাকে লালন করতেন। প্রতি মুহূর্তে ভাবনাচিন্তার ভেতরে থাকতেন।

এ প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত পরিসরের কিছু কথা বলে ফেলা জরুরি। অশোক মিত্রের মা ছিলেন ঢাকার বিখ্যাত মালখানগরের বসুঠাকুর বংশের কন্যা। আমার মাতামহী শোভারানী ঘোষও সেই একই বংশের মেয়ে। এবং দুজনের পারিবারিক সম্পর্ক ছিল বোনের। অর্থাৎ অশোক মিত্রের মাসি হতেন আমার দিদিমা। সে অর্থে উনি আমার মামা স্থানীয় হতেন নিশ্চয় তবে আমার দিক থেকে কখনো এ পরিচয় দিয়ে আলাপ করার স্পর্ধা হয়নি যদি না উনিই আমাকে একবার নিজে থেকে ফোন করতেন, আমার কোনো কবিতা পড়ে।

একদিন ফোন পাই, সেই বিখ্যাত কাঁপা কাঁপা অথচ দৃঢ় বাচন, শুনেই আমার হৃদ স্পন্দন বেড়ে যায়।

'আমি অশোক মিত্র বলছি। আমি আপনার কবিতার ভক্ত। কিন্তু গদ্য লিখতে হবে যে, আমরা অন্য ধারার একটা কাগজ করছি, *আরেক রকম*। আমি চাইছি আপনি লিখুন' এবং ক্রমশ

প্রকাশ করলেন, তিনি ভোলেননি আমার দিদিমা শোভারানী ঘোষ অর্থাৎ তাঁর বেবিমাসি! দক্ষিণপন্থী, ভারতীয় জনসংঘের একদা প্রেসিডেন্ট দেবপ্রসাদ ঘোষের ঘরনি শোভারানী ঘোষ।

সত্তরের দশকে শুনেছি আমার দিদা বলতেন, আমাগো ভ্যাদনের ছেলে ত এখন মন্ত্রী। সে আমার শৈশবকালে শোনা, দিদাদের অনেক আত্মীয়দের নামগুলিই ছিল এমন অদ্ভুত, মেথু ভানু ছুনি খান্তু ইত্যাদি। কথাটা মাথার কোনো কোণে গোঁজা ছিল। কিন্তু অশোক মিত্রের মুখে যখন এই পারিবারিক পরিচয় মান্যতা পায় তখন আশ্চর্য হয়ে যাই।

এই দেবপ্রসাদ এমনকী, জীবনানন্দ বুদ্ধদেব বসুকে ল্যাম্পুন বা ব্যঙ্গ করে কবিতার বইও লিখেছিলেন ত্রৈরাশিক, গণিত নহে, রসায়ণ নামে। দেবপ্রসাদকে তাঁর দক্ষিণপন্থী মতাদর্শের জন্য সব লেখায় প্রচন্ডভাবে সমালোচনা করেছেন বামপন্থী অশোক মিত্র। কিন্তু ভোলেননি পারিবারিক নৈকট্য, শোভামাসি বা বেবিমাসিকে। ক্ষুরধার বাচনে আঘাত করতে পারতেন নিজের যা পছন্দ নয় সেইসব ব্যবহার বা মতাদর্শকে, এই মেধার সঙ্গে নিজের যা কিছু তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা বা আমাদের মতো অকিঞ্চিৎকরদের প্রতি স্নেহ, দুটোই অদ্ভুত মেলবন্ধন বলে মনে হত আমার।

আরেক রকম পত্রিকায় বেরোনো *স্মৃতিবিস্মৃতি* নামের ধারাবাহিক লেখায়, 'অথ কুলকলঙ্কগরিমা কথা' নামের অত্যন্ত স্বাদু, রসাল এবং ব্যঙ্গবঙ্কিমভাবে নিজের পারিবারিক ইতিহাসচর্চিত লেখায়, সে কথা তিনি উল্লেখ করেওছিলেন। কিছুটা তুলে দেবার লোভ সংবরণ করা যাচ্ছে না। কেননা এখানে অশোক মিত্রের সেই অসামান্য গদ্যের স্বাদও কিছুটা পাওয়া যাবে।

'বৃটিশ শাসনের প্রথম পর্বে কর্নওয়ালিস সাহেবের একটি বিশেষ চতুরালি ভারতবর্ষের পূর্বাংশে মুষ্টিমেয় বিদেশিদের আধিপত্য পাকাপোক্ত করতে প্রভূত সাহায্য করেছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রমাদে উচ্চবর্ণীয় বাঙালি-হিন্দুদের অন্তত দেড়শো বছর নিশ্চিন্ত আরামে কেটেছে।... পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ জেলাতেই... বৈদ্য ও কায়স্থ সম্প্রদায়ভুক্তরাই জমিদারিত্বে জমিয়ে বসলেন।... উচ্চবর্গীয় হিন্দুরাই ইংরেজি ভাষায় তালিম নিয়ে প্রশাসনের বিভিন্ন অঙ্গনে বিদেশি শাসকদের আদেশ-নির্দেশ পালনে আত্মনিয়োগের সুযোগ পেলেন। সচ্ছলতা ও বিদেশি ভাষায় দীক্ষা অনেক ক্ষেত্রেই নানা ধরণের প্রতিভার জন্ম দিল এসব পরিবারে... একটি উচচ কুলীন কায়স্থ বংশ ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণার মালখাঁনগর গ্রামের বসুঠাকুর পরিবার। ঠাকুর লেজুড়টি কবে বংশপদবীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তা অবশ্য সপষ্ট করে জানা যায়নি, তবে বংশ গরিমা জাহিরে এই পরিবারেরও কোনোদিন খামতি ছিল না। শাসন প্রজাপীড়ন পরিচিত অভ্যাসের মতো, পাশাপাশি বিদ্যাচর্চা, বিভিন্ন প্রকৃতির সংস্কৃতিচর্চাও।... খোদ বুদ্ধদেব বসু এই বংশজাত, একসময় শিশুসাহিত্যিক সুনির্মল বসুও, এমনকী সম্প্রতি প্রয়াত ক্ষুধার্ত কবিদের মস্ত পৃষ্ঠপোষক-পরে ভদ্দরলোক বনে যাওয়া উৎপলকুমার বসু পর্যন্ত। দিলীপ কুমার রায়ের অনুশীলনে কণ্ঠনালীকে ক্ষইয়ে দেওয়া অকালপ্রয়াতা সংগীতশিল্পী উমা বসু মালখানগরতনয়া, একদা হিমাংশুকুমা দত্তের চামেলি পর্যায়ের গানগুলির সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত সাবিত্রী ঘোষও একই বংশজাত।... বংশগৌরব প্রচার করা দাবি করেন নারীশিক্ষার ক্ষেত্রেও তাঁরাই পথ দেখিয়েছেন। গোটা বিক্রমপুর পরগণার প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট শোভারানী বসু তাঁদেরই বংশোদ্ভুতা। (শোভারানী যাঁকে গ্রামে সবাই 'বেবি' বলেই জানত অচিরে পরিণয়বদ্ধ হন গণিতে গভীর পন্ডিত দেবপ্রসাদ ঘোষের সঙ্গে)। গণিত পেরিয়ে তাঁর পান্ডিত্য সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাস পেরিয়ে বহুদূর বিস্তৃত। ইংরেজি ও অন্যান্য বিদেশি সাহিত্যেও তাঁর গভীর জ্ঞান অথচ প্রচন্ডরকম হিন্দু রক্ষণশীল, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জনসংঘ রাজনৈতিক দলটির প্রথম সভাপতি এই দেবপ্রসাদ ঘোষ। যিনি সবরকম আধুনিকতার বিরুদ্ধে, তদানীন্তন কালের বাংলা কবিতাচর্চাকে বিদ্রূপ করে বহু প্রবন্ধ লিখেছেন, তাঁর সাক্ষাৎ দৌহিত্রী যশোধরা রায়চৌধুরী যে এ ধরণের কবিতা লিখে এহন আমাদের চমকে দিচ্ছেন তা যদি তাঁর বহুদিন প্রয়াত দাদামশায়ের চোখে পড়ত কি কুরুক্ষেত্রই-না বেধে যেত।

এই অসম্ভব মেধাসম্পন্ন ভাষায় আক্রমণ, একমাত্র অশোক মিত্র মহাশয়ের পক্ষেই সম্ভব ছিল।

প্রথম ও শেষবার অশোক মিত্রের বাড়িতে যাই ২০১৫ নাগাদ। আলিপুরে। অনেকক্ষণ কথা বলি এবং পরিপাটি করে খাই লুচি তরকারি দার্জিলিং চা ও দারুণ সব মিষ্টি। আতিথ্যে ঢাকাইয়া বাঙালেরা চিরদিনই অনন্য, কে তা না জানে।

কেন গিয়েছিলাম? হয়তো আপাত দৃষ্টিতে *আরেক রকমে*-র সূত্রেই, কিন্তু আমার কেমন যেন মনে হয়েছিল, আমার এই যাওয়া জরুরি, ওই পারিবারিক দায় থেকেই। কথায় বলে স্নেহ নিম্নগামী। এই ব্যক্তিটি আমাকে নানা সময়ে কী যে উৎসাহ দিয়েছেন কবিতা লেখায়। একটি বই পাঠিয়েছি, সেটি পড়ে ফোন করে উচ্ছ্বসিত হয়ে কথা বলেছিলেন অনেক দিন আগে। তা ছাড়াও নিজের লেখার! ভেতরে কবিতার আলোচনায় আমাকে উল্লেখ করে লজ্জা দিয়েছেন। তবে, তাঁর সম্পাদিত *আরেক রকম* পত্রিকাটি যখন থেকে বেরুতে শুরু করেছে, তখন থেকে আমার কাছে সর্বজনশ্রদ্ধেয় এই মানুষটির মূল্য অন্যরকম।

এটাই হয়তো ওঁর মতো মানুষের বৈশিষ্ট্য। শিকড়ের প্রতি মায়াবান ও যত্নশীল। আমার প্রণাম। নবতিপর ব্যক্তির মৃত্যুতে কোনোভাবে অসময় শব্দটি ব্যবহার করা হয় না। কিন্তু এটা বামপন্থার খুব অসময় তো বটেই। মে ডে-তে এই দুঃসংবাদ পেয়ে মনে হল একটা অদ্ভুত সমাপতন। হারিয়ে ফেলা সময়ের এক মানুষকে প্রণাম। তাঁর অযাচিত স্নেহ পেয়েছি এ-কথা যেন ভুলে না যাই।

অশোক মিত্র: কুকথার স্বত্ববিলোপ

সুমন ভট্টাচার্য

পয়লা মে, ২০১৮। সংবাদটি এল। আসবার প্রস্তুতি ছিল। কিন্তু কোথাও কোনো যুক্তিরহিত অথবা চিকিৎসাশাস্ত্রের অগ্রগতির কারণেও যুক্তি সমর্থিত বিশ্বাসও ছিল, যে তা অন্যরকম হতেও পারে। বয়স পরিণত। সুতরাং সে বিষয়ে অভিযোগ থাকে না। কিন্তু সমাজ সংস্কার যে উলটপুরাণের ঋণাত্মক লীলায় ক্রমশ অপরিণতমনস্ক হতে থাকা স্বদেশে সংসারে, তাঁর উপস্থিতির 'উপযোগ' আমরা অনেকেই প্রতিদিন বোধ করছিলাম, যাঁর কুকথার দিকেই উৎকর্ণ থাকতাম আমরা— কবিতায় ব্যবহারিক বোধবুদ্ধিহীন জনমনুষ্য— আমাদের কাছে এই ঘটনাটি, কোনোরকম ন্যাকামি না-করেও, বলতেই হচ্ছে ক্ষতির অশেষ।

উমেদার আর তাঁবেদারদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাদীপ্ত পরিমণ্ডলীতে তিনি কারো প্রিয় ছিলেন না। মা প্রয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্-এর সুভাষিতে আস্থা ছিল না তাঁর। আর সেই কারণেই তাঁর কথাকে বা তাঁর লেখাকে বিশ্বাস করবার একটা উদ্‌বৃত্ত শক্তিতে গড়ে উঠেছিল আসক্তির নাথধর্ম।

অবশ্যই এই প্রবণতায় অশোক মিত্রকে পাঠ করাও অনুচিত। কিন্তু আমরা, যারা মোটামুটি ১৯৮৬/৮৭ থেকে অশোক মিত্রকে পড়া আরম্ভ করেছি, কলকাতার ঘেরাটোপে আর্থিক উচ্ছলতা না-থাক, সামাজিক নিরাপত্তা নিয়ে তখনও চিন্তিত হতে হয়নি তেমন, আমাদের কাছে, বা সেই আমাদের কাছে অশোক মিত্র কি খুব প্রিয় লেখক ছিলেন? 'কবিতা থেকে মিছিলে' প্রথম বার পড়ে আপ্লুত হয়েছি না ক্ষুব্ধ? কিন্তু সময়ের প্রতিশোধ বড়ো তীব্র। 'হোপ এইটটি সিক্স'-এর 'সাফল্য-সংবাদ'-এ এবং আরো মেজো-সেজো হোপ-এর হেফাজত-বন্দি হতে থাকা যে প্রশাসন তার ওপর বিশ্বাস সরে যাওয়ার যে আরম্ভ— তখন মাঝে মাঝে অশোক মিত্রর যে ভাষ্য প্রকাশ পেত, আমাদের তো আস্থার সূচনা সেখান থেকেই।

রাজনৈতিক মতাদর্শ, তার বিচারশীল গ্রহণ-বর্জনের বা গ্রহণীয়তার তীব্র বিতর্ক শেষ করে তখন তো আরম্ভ হয়ে যাচ্ছে 'লাল-উল্‌কিতে পরস্পরকে চেনা'-র উলটাবুঝিলি রাম পদ্ধতি। এই সময় থেকে আমাদের অনেকের কাছে অশোক মিত্র আশ্রয় হতে আরম্ভ করেছেন। এবং ক্রমশ সংবাদের বিসংবাদ ভেঙে সত্যের চেহারা বুঝবার চেষ্টার সময় সহায় হয়েছেন অশোক মিত্রই।

১৯৮৬, অর্থাৎ যখন আমরা, অনূর্ধ্ব অষ্টাদশবর্গ তাঁর লেখা পড়ছি, পড়তে আরম্ভ করছি, তিনি তখনও মন্ত্রী অশোক মিত্র। সুতরাং, তাঁর অভিমতের সঙ্গে আমাদের, ধারণা— বলা যাবে না, prejudice অর্থে, সংস্কারের অমিল ঘটলে কূট বা কটুমন্তব্যে আত্মতৃপ্তির তুঙ্গে যাওয়াটা ছিল আরেক নেশাই। কিন্তু সময়ের প্রতিরোধ বড়ো মর্মান্তিক। 'কবিতা থেকে মিছিলে' পড়বার সময়, প্রথম বার ঠাহর হয়নি যে তা ১৯৬৮-র প্রবন্ধ। কিন্তু ক্ষুব্ধ করেছিল তাঁর সেইসব বাক্যবন্ধ— 'কবিতায় মাংস নেই, রক্ত নেই, অনুনাসিক শব্দের কণ্ডূয়ন;... মানছি কবিতায় প্রচুর দক্ষতা এসেছে, কিন্তু প্রাকৃত ভাষায় বলা যায়, ওই দক্ষতাকে ইয়ে করি। ' (প্রবন্ধ সংকলন, পৃ. ১৫১-৫২)— এ কেমন ভাবনা! আর প্রাকৃত ভাষায় যদি বলতেই হয়, তা 'ইয়ে'র আড়ালে থেমে থাকা কেন? কিন্তু ওই যে, সময়ের প্রতিশোধ— তা শেখাল এই প্রাকৃতের আড়ালে কোন অতিপ্রাকৃতের অবস্থান! প্রথম পাঠপর্বে জানা ছিল না, একটু পরে পঠিত, ১৯৮৬-র পাঠকের কাছেই নয়, ১৯৬৮-র পরিণত যুবাদের কাছেও সেই প্রবন্ধ প্রশ্ন তুলেছিল। এই প্রবন্ধের দিকে প্রশ্নশীল একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন বিমল রায়চৌধুরী। তাহলে 'কুকথা'-র তেজ এতটাই যে প্রায় কুড়ি বছর টপকেও তা সমান জ্বালা ধরানো হয়ে থাকতে পারে?

২.

২০০০ সালে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে প্রকাশিত হয় তীর্থংকর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *একদিন শতাব্দীর শেষে / জীবনানন্দ স্মারক সংকলন*। শতবর্ষের শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদনের আটচালায় তীক্ষ্ণ এক বিরুদ্ধ স্বর। জীবনানন্দের বেশ অনেক পোস্টকার্ড চিঠি ছিল তাঁর

সংগ্রহে— এই কথার পরেই পাঠকের প্রস্তুতিতে প্রায় হুঁকোর জল ঢেলে লিখলেন:

> প্রায় প্রতিটি চিঠিতে একই আর্তনাদ, যদি তাঁর জন্য আড়াইশো টাকা-তিনশো টাকা মাসিক মাইনেরও কোনো শিক্ষকতার ব্যবস্থা করে দিতে পারি আমি এবং আমার বন্ধুজন, চিরকৃতজ্ঞ থাকবেন তিনি। আমরা পারিনি।... তাঁকে উদ্ধারের জন্য তেমন কাউকেই এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি।
>
> 'ভীষণ সালিশি', পৃ. ২৩৩-২৩৫

অশোক মিত্র দু-একটা কথার স্পষ্ট দাগে চিনিয়েছিলেন সেই সময়ের আঁচড়— জীবনানন্দের সাহিত্যকর্মকে সম্মান জানানোর মতো পাঠক এবং প্রজ্ঞা-প্রতিষ্ঠিত পাঠক তখন নেই। যে তরুণরা তাঁর কবিতাকে গ্রহণ করছেন 'তাঁরা তো তখনও অপোগণ্ড বলে বিবেচিত' ('ভীষণ সালিশি', পৃ. ২৩৪) এবং যিনি ছিলেন জীবনানন্দের কবিতার অনুরাগী, সেই বুদ্ধদেব বসুও 'বরিশাল-উত্তর জীবনানন্দের কাব্যপ্রয়াস ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারছিলেন না' (ওই, পৃ. ২৩৪)। আর প্রবন্ধের শেষভাগে অশোক মিত্র তীব্র আপত্তি জানান জীবনানন্দের উপন্যাস বিষয়ে। বলা বাহুল্য, সেই বক্তব্যও ভালো লাগেনি তখন। কারণ— আবিষ্কৃত হচ্ছেন ঔপন্যাসিক জীবনানন্দ— তা নানারকমভাবে বিশ্লেষিত হচ্ছে, আলোড়িত হবে— হয়ে উঠবে সাহিত্যের গবেষণার উপাদান 'চিকিৎসক' উপাধি— আহরণের অসামান্য মৃগয়াভূমি!! সুতরাং সে-কথা তো ভালো লাগবার বা মানবার নয় তখন। কিন্তু যা বিঁধেছিল তার পুনরুচ্চারণ এখন আবার জরুরি:

> জীবনানন্দর গদ্যরচনা বাজার 'খেয়েছে'।... আমার কাছে এই সমস্ত-কিছু বীভৎস নিষ্করুণ অশ্লীলতা, কিন্তু গলা উঁচু করে যদি বলতে চাই একঘরে হয়ে যাব...। ('ভীষণ সালিশি', পৃ. ২৩৫)

এখানে শেষ 'আমি'টি আর ব্যক্তি অশোক মিত্র থাকেন না— যিনি বা যাঁরাই ভিন্নমতের, তাঁরা সকলেই। বরং অশোক মিত্র যা লেখেননি, তা শোনা যায় অরুণকুমার সরকারের লেখায়:

> মনে পড়ে এক অবিস্মরণীয় সন্ধ্যায় নিমগাছের ছায়ায় তাঁর ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ির রোয়াকে বসে জীবনানন্দকে আমরা নরেশ, অশোক আর আমি প্রাণ ভরে জীবনানন্দেরই কবিতা শুনিয়েছিলুম। অভিভূত করে দিয়েছিলুম তাঁকে।
>
> 'দূরের আকাশ', *তিরিশের কবিতা এবং পরবর্তী*, পৃ. ৭

জীবনানন্দের সেই তৃপ্তি, নিশ্চিতই কবি জীবনানন্দের আশ্রয়, কিন্তু সাংসারিক দায়িত্বে বিভ্রান্ত যে জীবনানন্দ, জীবিকার সন্ধানের জন্য অতি কনিষ্ঠ তরুণের কাছে 'আর্তনাদ' করেন, তাঁর সেই অসহায়তার নিরসনে অক্ষমতা বড়ো হয়ে উঠেছে অশোক মিত্রের কাছে। আমরা যারা আরো দূরের পাঠক— আমরা তো আরো অসহায়! কিন্তু কথাটা সেই অসহায়তা নিয়ে তো নয়, অশোক মিত্রের যে বিরক্তি গড়ে উঠেছিল, তিনি এই লেখায় যে কথাটি আদতে জানালেন, তা পাঠকের কাছে কালপ্রাজ্ঞ হওয়ার বার্তা। বিচারবোধেরও। আমরা আমাদের যাপনে তা কতটা হতে পারছি! কিন্তু হতে যে হবে, সেই দাবি থেকেই না তাঁর নিরন্তর লেখালিখি। যেটুকু শ্রুত, যেটুকু জ্ঞাত এবং পঠিত— তাঁর লেখালিখির সঙ্গে গত তিরিশ বছরের ধারাবাহিকতায়— এই লেখালিখির তেমন কোনো প্রশংসার মুখাপেক্ষী তিনি কদাপি ছিলেন না। যে অসংগতি হাসির উপাদান নয়, যে অসংগতি আমাদের সম্মিলিত সামাজিক অবস্থানকে নিয়তই বিঘ্নিত করছে, নষ্ট করছে উত্তরকালের নিরাপত্তাকে তার মোকাবিলার জন্য, তার নিরসনের জন্য প্রস্তুতির মন আর শিক্ষা— যেন গড়ে ওঠে নির্মোহ যুক্তিবুদ্ধি। একটা জায়গা থেকে দেখলে হয়তো বোঝা যাবে। অশোক মিত্র বাংলা কবিতার নিয়ত সাম্প্রতিক ধারা বিষয়ে যেমন অভিযোগপ্রবণ ছিলেন, তার অমেরুদণ্ডী চারিত্র্যে— তেমনি আবার তাঁর মুগ্ধতাও ব্যক্ত করেছিলেন রাধারাণী দেবীর কবিতায় ('অপরাজিতা', *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, পৃ. ৭২-৭৪)। কেন?— এখানে তাঁর দর্শনের একটি খণ্ড দেখা যায় যে, রাধারাণী দেবী তাঁর অভিজ্ঞতা আর জীবনযাপনের পরিধি থেকে যা লিখেছেন, তা সেই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও সত্য। সেখানে কোনো আরোপিত 'গাম্ভীর্য' বা তত্ত্ববিশ্বের অবতারণা বা তার চেষ্টা ছিল না। 'নিজের পৃথিবীর পরিধির মধ্যে স্থিত থেকে পরিপার্শ্বকে ভালো লাগা, ভালোবাসা: কেউ যদি স্রেফ এইটুকুই শুধু করেন, প্রতিভাকে ওই খণ্ডিত, সীমিত পৃথিবীর কলকাকলিতেই শুধু নিয়োগ করেন, আমি বলব তাও সমান নিখাদ, সমান শিব।' (ওই, পৃ. ৭৪)— অশোক মিত্র আজীবন তাঁর নিজস্ব লেখালিখিতে বজায় রেখেছেন এই আদর্শবোধ। একদা কবিতা লিখতেন— পরে, অন্তত প্রকাশ্যত, তা থেকে স্বয়ং প্রত্যাহৃত। কিন্তু তাঁর কবিতা-মগ্নতা, বাংলা কবিতার কাছে তাঁর পাঠকপ্রত্যাশা তো নানাভাবে লিখেছেন। এবার আবার সময় এসেছে, তাঁর প্রত্যাশার লেখচিত্রে মন দেওয়ার।

অশোক মিত্রের যে লেখাগুলি একান্তই স্মৃতিচারণদীপ্ত, সেখানেও যাঁদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল, যাঁরা অনেকেই নেপথ্যনিবাসী, তাঁদের কথা যেভাবে বলেন, আতোয়ার রহমান, বা ধ্রুব মিত্র বা রবি সেনগুপ্ত তা-ও হয়ে থাকে বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস। আর ওইটুকু বুঝতে হবে, তিনি ইতিহাস

হয়ে থাকার জন্যই তা লেখেননি, তিনি চাইছিলেন— চেয়েছেন, তার যথাযথ ধারাবাহিকতা। ইতিহাসের বিভ্রান্তি নিয়ে নয়— সমাজ সাপেক্ষ সক্রিয়তা নিয়েই।

৩

গত শতকের নয়ের দশকের শুরু থেকেই যে সুখবাদী 'ভাব' বা দৈত্যসুলভ স্বার্থ-অন্বেষায় বদলাতে থাকে সমাজ মনের— গড় মধ্যবিত্ত সমাজমনের ধরনগড়ন, তাকে তো প্রশ্ন করেছিলেন তখনই। বিদ্যালয়-শিক্ষায় যখন শিক্ষার্জন বা অধ্যয়নের মৌল তাগিদের বদলে মাথা তুলেছে নম্বরপ্রাপ্তির 'মুদ্রা'রাক্ষস— উপাধির ক্ষেত্রে জায়গা নেবে মুদ্রাপ্রদায়ী যোগ্যতা— শিক্ষকেরাও শুধুই নম্বর এবং উপার্জনের ক্রমোচ্চতার সমীকরণ প্রতিষ্ঠায় তুখোড়, তখন:

> কখনো-কখনো তাই ভয়ে নীল হয়ে আসি। এত বেশি ঐশ্বর্যচিন্তার সমারোহ, সম্ভোগের হাতছানি, এত বেশি টাকা চিনতে শেখানো হচ্ছে বর্তমান সমাজব্যবস্থায় মানুষজনদের, ছাত্রদের, শিক্ষকদের, অন্যান্যদেরও, যে আশঙ্কা হয়, আরো টাকার ধান্দায় ছুটতে গিয়ে আদৌ যাদের টাকা নেই তাদের কথা কবে থেকে যেন আমরা ভুলে-মেরে দিতে শুরু করবো।
>
> 'শামসুদ্দিন স্যার-নগেনবাবুরা', *প্রবন্ধসংগ্রহ*, পৃ. ৩০

বলার কথা, রচনাকাল ১৯৯২!

এর পরের পঁচিশ বছর— প্রাইভেট কলেজ-এর প্রবল রমরমার ধীর সূচনা আর প্রবল বিস্তারের কাল! সমস্ত গণমাধ্যম— সাময়িকী থেকে দূরদর্শনে শুধুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন! শিক্ষা— অধুনা নিতান্তই বাণিজ্যপণ্য! তাঁর কুকথায় তখন কর্ণপাত করা হয়নি। আজ কর্ণমর্দনের কালেও কি বুঝতে পারছি? সম্ভবত কর্ণকর্তন যোগটি দেখা না-দিলে আক্কেল হবে না! আর তখন সেই আক্কেলও নিতান্তই নিরর্থকই হবে। শঙ্খ ঘোষের কবিতার কথায় 'চেতাবনি ছিল ঠিক তুমি আমি বুঝতেই পারি নি'— সেই চেতাবনি অশোক মিত্র। আর সেই চেতাবনি তো রয়েছেই। যদি সত্যিই তাঁকে স্মরণ করতে হয়— তো তাঁর সেই কুকথার নিরন্তেই মনোযোগী হতে হবে তো আমাদের। আর তো কেউ অমনতর কুকথায় ভর্ৎসিত করেননি— তার স্বত্ব যদি লুপ্ত হয়, তবু তার শর্তে এবার সময় এল আত্মশাসনের, আত্মসংস্কারের!

পরিশেষ

অশোক মিত্রকে সামনাসামনি কথা বলা দূরত্বে দেখেছি তিন বার। প্রথম বার বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদে, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য স্মারকব ক্তৃতায়— সাল সম্ভবত ১৯৮৩, ভুল হতে পারে। একবার ১৯৮৮-র কলিকাতা পুস্তক মেলায়। যে স্টলে দাঁড়িয়ে বই দেখছিলাম, তিনিও এলেন, ঠিক পাশে দাঁড়িয়েই বই দেখছিলেন। বিপণিচালকের উদ্‌বৃত্ত মনোযোগকে গুরুত্ব দেননি। এবং একবার ১৯৮৭-র মে মাসে, বা জুন-এ তাঁর আলিপুরের ফ্ল্যাটে গিয়েছিলাম, মদীয় পিতা, প্রয়াত সুবীর ভট্টাচার্যের সঙ্গেই। দুঃসহ স্পর্ধায় 'উপহার' দিতে গিয়েছি আমাদের, তমোনাশ ভট্টাচার্য আর আমার যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত *উৎসার* পত্রিকা। পত্রিকাটি নিলেন, এক ফর্মার পত্রিকা— হাই মাইনাস পাওয়ার ঝলসানো চশমা একটু টেনে দেখলেন— পড়লেও প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠা। সিদ্ধেশ্বর সেন, এবং আরো কয়েক জন খ্যাতনামা কবির লেখা ছিল— মন দিয়ে পড়লেন সম্পাদকীয়। তারপরেই ভর্ৎসনায় তীব্র: তোমাদের নিজেদের লেখা কোথায়? তোমাদের বক্তব্য কোথায়? এই কবিতাগুলোর মধ্যে তোমরা কোথায়?— বলে আবারও হাতে ফেরত দেওয়ার মুহূর্তে তাঁকে লিখে দেওয়া পৃষ্ঠাটি দেখে নিজের কাছেই রাখলেন। দুটি রসগোল্লা, এক গেলাস জল এসেছিল। তখন রসগোল্লা তো আমার কাছে লঙ্কাবাটা ভরপুর উচ্ছেসেদ্ধ। কণ্ঠ একটু কোমল হল: নিজেদের কথা বলো। তোমরা কী ভাবছ— তার কথা না থাকলে— এঁদের লেখার জন্য তোমরা পত্রিকা করবে কেন?— বাইরে এসে বাড়ি ফেরার পথে তখন মনে পড়ছি ল আবার 'কবিতা থেকে মিছিলে' প্রবন্ধটি। বুঝতে পারছিলাম, পড়াটা ঠিকঠাক হয়নি। পরের দুটি সংখ্যায় চেষ্টা করেছিলাম, নিজেদের কথার— কিন্তু তাঁর চোখ দিয়ে পড়বার চেষ্টায় বুঝলাম হয়নি। জানি না— সেই হওয়াটা কবে হবে— তবু হতে যে হবে, সেই চেষ্টা করাটাই এত বছর পরেও হোক, তাঁর ভর্ৎসনার সম্মান।

ভদ্রলোক এবং কমিউনিস্ট ও কিছু তেতো কথা

ইমানুল হক

১

'অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিবেক ছাপিয়ে আমাদের ভীরুতা বড় হয়ে ওঠে।' লিখেছেন অশোক মিত্র। 'চারটি উৎক্ষিপ্ত মন্তব্য' প্রবন্ধে। 'কবিতা থেকে মিছিলে' গ্রন্থে। শুধু কি ভীরুতাই? স্বার্থপরতাও কি নয়? বিবেকহীন আত্মপ্রচারসর্বস্বতা? আত্মমুগ্ধ আত্মরতি? তাও কি অনিবার্য এক স্বমেহনী ঘাতক হয়ে দাঁড়ায় না যশোপ্রার্থীদের কাছে। যাবতীয় ক্লেদ ও প্রতিভা নিয়ে?

২

অশোক মিত্রের মৃত্যু আমাদের অনেক প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়। ভালো ভালো কথা খুব ভালো শোনায়। কিন্তু প্রশ্ন কি উঠবে না, আমরা তাঁর জীবদ্দশায় কতটুকু দায়িত্ব পালন করেছি? ব্যক্তিগতভাবে, সাংগঠনিকভাবে, সামাজিকভাবে? পঞ্চাশের দশক থেকেই যাঁর লেখার ঔজ্জ্বল্য মুগ্ধ করেছে বুদ্ধদেব বসুর মতো উন্নাসিককেও, ৯০ বছর বয়সেও সমানে লেখালেখি চালিয়ে যাওয়ার পরও তাঁর রচনাবলির একটি খণ্ডও কেন প্রকাশিত হয় না জীবদ্দশায়? তাও অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ, তিনি উদ্যোগ নেওয়ায় অন্তত রচনাবলি বের হবে। অনেকেই বলবেন, তিনি আলোচনা চাননি। চাননি? এক 'ঈক্ষনিকা'র মতো একটি অনামি পত্রিকা ছাড়া কেউ কখনো কোনো বিশেষ সংখ্যা করলেন না। কেন? কোনো সম্মাননা গ্রন্থ? কোনো সংবাদপত্রে তাঁকে নিয়ে সংবাদ ছাড়া কোনও লেখা? তাঁর মৃত্যুর পর লেখা গেলে, জীবদ্দশায়? অন্যায় বোধ করি হত না তাঁর লেখা নিয়ে আলোচনায়? ৮৫ বছর বয়সে এক বৃদ্ধ পত্রিকা বের করছেন, এবং তা 'ডেটলাইন ফেল' না করে প্রকাশিত হচ্ছে ৫৬ পাতা নিয়ে মাসে দু-বার, সঙ্গে আছেন একালের আরেক শ্রেষ্ঠ লেখক কবি শঙ্খ ঘোষ— তা কি আলোচ্য বিষয় হতে পারত না কোনো সংবাদপত্রের রবিবাসরীয় বা বারোয়ারি বা বাসরের?

৩

অশোক মিত্র মার্কসবাদী। কিন্তু মার্কসবাদী দৈনিকে তাঁর লেখা ছাপা বন্ধ। তাঁর পত্রিকা 'আরেক রকম' সম্পর্কেও এক লাইন বের হয় না। পাঁচ বছর ধরে। এখন ফুল মালা লেখা— ছয়লাপ। কিন্তু এগুলি কি পাথরের চেয়ে ভারী নয়? নেতিবাচক কথা না বলাই ভালো, কিন্তু অশোক মিত্র বেঁচে থাকলে, বা দেখতে পেলে তার কি বিবমিষা হত না?

৪

অশোক মিত্র লেখকদের লেখক। রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম, সৈয়দ মুজতবা আলী, অবন ঠাকুর, শঙ্খ ঘোষ বাদ দিলে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গদ্যশিল্পী। রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম ছাড়া আর কেউ এত বিচিত্র বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেননি।

অশোক মিত্র শুধু রাজনীতির মানুষ নন, সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য, অর্থনীতি— সর্বত্র তাঁর বিচরণ। একদিন আসবে, যেদিন মানুষ, বিস্মিত হয়ে বলবে, এমন একটা মানুষ ছিলেন? এই বাংলায়? আর্থিক সংকটে ছিলেন। হ্যাঁ ছিলেন। অতি ঘনিষ্ঠ মানুষ দু-একজন ছাড়া কেউ জানতেনও না। কিন্তু কারও সাহায্য চাননি— এমনই মানসিক দৃঢ়তা। কেউ করতে গেলে সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

৫

অশোক মিত্র। শ্রেণিচেতনা যাঁর শেষ মুহূর্তেও অটুট, যাঁর মতো নিপুণ, তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তি আর কোনো বাঙালি পাবেন কিনা জানি না। অবন ঠাকুর, শঙ্খ ঘোষ বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথ, সৈয়দ মুজতবা আলী, এমন গদ্যশিল্পী কবে মিলবে কে জানে? মার্কসবাদী বীক্ষা আর রবীন্দ্র-শিক্ষা যাঁর চিন্তা ও চিন্তনের মর্মবাণী, ৮৫ বছর বয়সে বের করলেন 'আরেক রকম'— কিশোরের সুতীব্র উদ্যম নিয়ে। বাঙালি আরম্ভ করে শেষ করে না— এ আপ্তবাক্যকেও মিথ্যা প্রমাণ করেছেন অশোক মিত্র।

নিজের নয়, দেশ-দুনিয়ার খবরে ছিল তাঁর আগ্রহ, হাসপাতালে শুয়ে ১২ এপ্রিলও খুঁটিয়ে জানতে চান সব। এককালে কবিতা লিখেছেন, পরে কবিতার ছন্দস্পন্দময় সুরেলা

অথচ তীক্ষ্ণ তার্কিক মননশীল ঋদ্ধ সম্পন্ন গদ্য— ইচ্ছেমতো দুমড়ে-মুচড়ে ফেলেছেন বাক্য ও শব্দকে, বিবেকানন্দ কথিত সাফ ইস্পাতের মতো, রাশিয়ান ব্যালে শিল্পীর মুনশিয়ানায় গদ্যকে করে তুলেছেন নূপুরের নিক্কণ, আর জলপথের বেহাগ আলপনা।

পত্রিকায় কোন লেখা যাবে, কেন যাবে এবং কেন যাবে না, কেন যাওয়া উচিত নয়— ভাবতেন, ভাবাতেন, বলতেন এবং বলাতেন, তার পাশাপাশি নির্ভুল ছাপা যাতে হয়, ডাকে বা হাতে— গ্রাহক বা লেখক পত্রিকা যাতে পান— তাঁর ছিল সজাগ দৃষ্টি। কোনো লেখক পত্রিকা না পেলে ফোন, সুজিতদা অথবা আমাকে; গ্রাহকরা না পেলেও। একইসঙ্গে অর্থ সংগ্রহ করেছেন। আজীবন/বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা হিসেবে—ডেকে বলেছেন, গ্রাহক করে দিতে হবে— জানিয়ে দিয়েছেন, হবু গ্রাহককে বলবে; ধরে নিন টাকাটা, ৫০০০/- টাকাটা জলে দিলেন। কিছু আজীবন সদস্যকে মুখোমুখি কথা বলিয়ে দিলাম। তাঁদের নিজের হাতে বিল দিলেন দু-একবার। সারাজীবনের স্মৃতি তাঁদের এসব। প্রথম দিকে আমার ভূমিকা ছিল, একান্তই পিছনের। সুজিতদা (পোদ্দার), মিহিরদা (ভট্টাচার্য), এবং রবিন মজুমদার মাঝে মাঝে নানা বিষয়ে ফোন করতেন। সবথেকে বেশি ফোন আসত তাঁর। বলতেন লেখার জন্য। আমি এমনই অক্ষম যে অসমর্থ হয়েছি বারে বারে। তারপরে শেষপর্যন্ত লিখেই ফেললাম— 'সে সব কথা কেন যে আজ কেউ বলে না' রোটারি সদনে শঙ্খ ঘোষের সভাপতিত্বে সমাজ চর্চা ট্রাস্টের বার্ষিক সভায় ২০১৩-র উৎসব সংখ্যা প্রকাশের দিন উল্লেখ করলেন। আমার লেখার, অনুরোধ করলেন পড়ার। (বহু ফসলি মাটির গন্ধ মাখানো স্মৃতি থাক একলা মনের)।

আমার মতো লেখকের এ অনুগ্রহ ভোলার নয়। বামফ্রন্ট সরকার প্রথম ১০ বছরে কী করেছিল তার তথ্যময় বিবরণ ছিল সে লেখায়। পরে দুয়েকটি সম্পাদকীয়ও লিখেছি। তাঁর আদেশে। বলতেন, তোমাকে লেখানো বড়ো সমস্যার। বড্ড দেরি কর। সম্পাদক হিসেবে ছিলেন, কাবুলিওয়ালা— একথা *আরেক রকম*-এর সঙ্গে যুক্ত লেখকরা বিলক্ষণ জানেন। কাকে, বলেছেন, কবে বলেছেন, কী বলেছেন প্রতিটি বিষয় মনে থাকত।

২০১৬-য় অসুস্থ হয়ে ভর্তি হলেন হাসপাতালে উডল্যান্ডসে। গেলাম। আমাকে দেখেই বললেন, না লিখলে তোমার আঙুল অপবিত্র হয়ে যাবে। লেখো। লেখো। লেখো। লেখা ছাড়া পরিত্রাণ নাই। হাসপাতাল থেকে বের হবার পর তাঁর ও সুজিত পোদ্দারের আদেশে নাম যুক্ত হল সম্পাদকীয় কাজে। তাঁর কাছে শিখেছি বহু। তর্কও করেছি। ২০১৭-তে একদিন একটু কড়া তর্কই। পরে মনে হয়েছে, না করলেই হত। তবে এ তর্কের ফল সামান্য হয়েছিল। তাতে অবশ্য সুজিত পোদ্দারের ভূমিকা অনেক বেশি। সম্পাদক পদ ছাড়তে চেয়েছিলেন ২০১৭-এর ডিসেম্বরে। ছাড়া হয়নি তাঁর। এই তর্ক করা ঠিক না বেঠিক— ধন্দ ঈষৎ আছে। আজও।

তিনি ছিলেন ব্রান্ডেড পোশাক আর বুকনিবাজির বিরুদ্ধে। চাইতেন, রাস্তায় নেমে লড়াই। কনজিউমারিজম নয়, কম্যুনিজম ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। গরিবের জন্য লড়াই চাইতেন। বড়োলোকের বিলাসিতার জন্য নয়। খ্যাতি প্রতিপত্তি নামযশের লক্ষ্য— সাম্যবাদ নয়— বলতেন তিনি।

তাঁর কাছে অনুলিখনের সুযোগ পেয়ে লেখা শিখেছি। শিখেছি, লেখা পড়ে; উজ্জ্বল চাকচিক্যময় পোশাক বাঙালির সংস্কৃতি নয়। জেনেছি— বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন ভুল ছিল। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ মানলে, ১৯৪৭-এর দেশভাগ প্রয়োজন হত না। প্যালেস্টাইনের 'হামাস' যে জঙ্গি সংগঠন নয়, বিপ্লবী বাহিনী জানিয়ে দেন সাহসভরে।

ইরাকি কাশ্মীর বা দান্তেওয়াড়ার লড়াকুরাও যে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের মতো কেউ— তাঁদের বুকেও হয়তো রয়ে যায় কোনো দেশপ্রেমিক স্বাধীনতাকামী প্রতিজ্ঞাবাণী— উচ্চারিত হয়েছে তাঁর লেখায়।

লাঙল যাঁর জমি তাঁর— পুঁজি যাঁর জমি তাঁর নয়— এই দীপ্ত দৃপ্ত বাক্যও শুনেছে পশ্চিমবাংলা— সারা দেশ। চিঠি ডাকে ফেলেননি, কিন্তু মনের কোণে ডাক দিয়েছেন বিদ্যুৎবাহিত বিপ্লবী আবেগের। সিঙ্গুর নিয়ে তাঁর সাহসী লেখা অনেকের প্রেরণা।

মাতৃভাষার জন্য তাঁর জেহাদ— রক্ত না দিলে ভাষা বাঁচবে না, বলেছেন, লিখেছেন। আমাদের সঙ্গে, ভাষা ও চেতনা সমিতির সঙ্গে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করেছেন। শুধু প্রবন্ধ লেখেননি। রাজপথে হেঁটেছেন। বলেছেন সর্বত্র। ভ্যাট এবং জিএসটি-র বিরুদ্ধে মুখর হয়েছেন। কেন্দ্র ও রাজ্যে ভ্যাট চালু নিয়ে সংসদে থাকাকালীন সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন। মার্কিনিরা এদেশে যে কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারবে— এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেও করেছেন সাংবাদিক সম্মেলন।

রাজ্য সরকার কর্তৃক ২০০০ খ্রিস্টাব্দে হরিপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের বিরোধিতা করেছেন। কার্গিল যুদ্ধের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন, পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের বিরোধিতা করেছেন— তোয়াক্কা করেননি কারও ভ্রূকুটির। লেনিনের অবমাননায়, 'টরাস' ছবিতে— তীক্ষ্ণ-তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর সমর্থন আমাকে শক্তি জুগিয়েছে। রাজ্যে 'পোটা' এবং 'পোকা'-র মতো আইন— 'মোকা' চালু করতে চেয়েছিলেন ২০০১-এ তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী। বিরোধিতা করেছেন।

জ্যোতিবাবুর কাছে পাঠিয়েছেন আমাকে দু-বার 'টরাস' এবং 'মোকা'-র প্রশ্নে। ২০০১-০২-এ যখন লেনিনের 'কী করিতে হইবে' পড়ার অপরাধে শিলিগুড়িতে গ্রেপ্তার হয়ে

যাচ্ছেন কয়েক জন যুবক তখন ভাষা ও চেতনা সমিতির বিবৃতিতে সই করছেন তিনি ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়— ভুলি কী করে?

ভোলা কি যাবে তাঁর তীক্ষ্ণ আর্তনাদ— সিঙ্গুর পর্বে তিনি চাইছেন, কেউ একজন, অন্তত নেতৃস্থানীয়, আসুক। কথা বলুক, শুনুক। কা কস্য পরিবেদনা। যাঁদের মধ্যস্থতায় ক্ষমতার তথা সরকারে যাওয়া সেই মানুষদের একজনের কণ্ঠস্বর শোনা হল না। ডাকে না-ফেলা চিঠি— বাতাস মন্দ্রিত করল। কিন্তু হৃদয়? মস্তিষ্ক? বোধ? অনুভূতি?

এসব কথা অনুচ্চারিত থাকাই ভালো। বলবে হিসেবি মন। কিন্তু কাউকে তো দায় নিতে হবে, সুখী সুখী তৈলাক্ত মুখের আড়ালে জমা যন্ত্রণার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনানোর।

আগামীতেও না হলে কর্তাভজা বাড়বে। মানুষের মনের ওপর কর্তৃত্ব কমবে। কমিটি সভায় চুপ থেকে হাত তুলে বাইরে সমালোচনা অ-কমিউনিস্ট-সুলভ কাজ। যা বলো স্পষ্ট বলো।

সবাই ভদ্রলোক বনে গেলে কমিউনিস্ট অ-বিনয়, যে আর থাকে না।

নিবেদন, কিন্তু কাকে? কোন মন ও মানসিকতাকে? ব্রান্ডেড শার্ট, ব্রান্ডেড জীবন আর ব্রান্ডেড ঘোষণার শিবারবকে।

এই রে থামা যাক। এসব ড. মিত্রের খুব প্রিয় শব্দ। শিবারব অ-বিনয়, উদ্ধত। ব্যক্তিগত সম্পর্ক, একুশ বছর ধরে তাঁর কাছে যাওয়া, শেখা নিয়ে লেখা যাবে বারান্তরে।

সবাই তো অন্যরকম লিখলেন।

এই তেতো লেখা একটু আরেক রকম হল না হয়।

টুকরো টুকরো যে যন্ত্রণা তিনি পেয়েছেন, তাঁকে অনেকে মিলে দেওয়া হয়েছে, নানাভাবে নানা প্রশ্নে— সেগুলো একটু আলোচনা দরকার।

না-হলে আরও মহা ভুল হবে।

অনেক পরিবার, অনেক মানুষ বিশেষ করে খেটে খাওয়া মানুষ, সংখ্যালঘু সুবিধা বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষ আরো বেশিদিন কষ্ট পাবেন।

অশোক মিত্র একজন বিপ্লবী কমিউনিস্ট লেখক। সুভদ্র। কিন্তু চিন্তা ও চেতনায় আপোশহীন।

বিপ্লবের স্বপ্ন ছিল তাঁর। সমাজবদলের। শুধু শ্রেণিসহাবস্থানে ঘৃণা ছিল ড. মিত্রের।

হাসপাতালে মৃত্যুর পর আইসিইউ-তে রাখা হল। দেওয়া হল তাঁর পেসমেকার। তারপর সই। সম্পর্ক লিখতে বললেন। কী লিখব? পুত্র, শিষ্য, অনুরাগী?

শেষে লিখলাম— কমরেড।

আমাদের মতো ঠোঁটকাটাদের শিক্ষক কমরেড, বিপ্লবী কমরেড। লাল পতাকার সাচ্চা খাঁটি মানুষ। আমার পিতা, সেলাম তোমাকে।

লাল সেলাম।

বাংলা ভারত পৃথিবী যেন তোমার মতো খাঁটি কমিউনিস্ট আবার পায়— যিনি শেষদিন পর্যন্ত আশা ছাড়েন না। স্বপ্ন দেখতে ভুলে যান না। এবং দেখাতেও।

আলো ক্রমে আসিতেছে

শাক্যজিৎ ভট্টাচার্য

সৎ বুদ্ধিজীবী কাকে বলে, এবং এই সমাজে সৎ বুদ্ধিজীবীর পরিণতি শেষপর্যন্ত কী হয়, এই বিষয়ে ২০০২ সালে নোয়াম চমস্কি একটা কৌতূহলোদ্দীপক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। নর্মান ফিংকেলস্টাইনকে নিয়ে। ফিংকেলস্টাইন ছিলেন প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি-র ছাত্র। জোয়ান পিটার্স নামক এক ভদ্রমহিলার একটি বেস্ট সেলার বইয়ের সমালোচনা লিখে ফিংকেলস্টাইন প্রথম মার্কিন সমাজের রোষানলে পড়েছিলেন। জোয়ান পিটার্সের বইটা ছিল ইজরায়েল বনাম প্যালেস্তিনীয় দ্বন্দ্বের বিষয়ে, যেখানে দেখানো হয়েছিল যে প্যালেস্তাইনের ভূমির উপর আদি অনন্তকাল ধরেই ইহুদিদের ন্যায্য অধিকার থেকে এসেছে বরং আরবরাই ওখানে বহিরাগত। ফিংকেলস্টাইন বছরের পর বছরের অক্লান্ত গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করেছিলেন যে জোয়ান পিটার্সের গ্রন্থটি অসত্য তথ্য, ইচ্ছাকৃত ভুল রেফারেন্স এবং আপন মনের মাধুরী মেশানো ব্যাখ্যাতে পরিপূর্ণ। যে মার্কিন রাষ্ট্রের অনির্বাণ আশীর্বাদে বলীয়ান হয়ে ইজরায়েল মধ্যপ্রাচ্যে তার দাদাগিরি অব্যাহত রেখেছে, তারা যে ফিংকেলস্টাইনের এহেন ব্যাখ্যাতে চটে যাবে সেকথা বলাই বাহুল্য। এর ফলস্বরূপ শুরু হল প্রবল ব্যারাকিং। ফিংকেলস্টাইনের পিএইচডি ডিগ্রি আটকে গেল বেশ অনেকটা সময়ের জন্য। যদিও প্রিন্সটন শেষমেষ ডিগ্রিটি দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু ফিংকেলস্টাইন তার পরেও বহু বছর কোথাও চাকরি পাননি। পরবর্তী জীবনে ইজরায়েলের মিথ্যাচার ফাঁস করে যে বইগুলি লিখেছিলেন, সেগুলির কারণে একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। ফিংকেলস্টাইন এখন নিউ ইয়র্কের একটি ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন। কাজ করেন বিদ্যালয় থেকে ড্রপ-আউট নিম্নবিত্ত কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে। প্রিন্সটনের মতো বিশ্বের সেরা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিও তাঁকে কোনো সম্মানজনক অধ্যাপনা দিতে পারেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এখনও নিয়মিত লিখে চলেছেন। গাজা স্ট্রিপে নির্বিচারে বোমাবাজির প্রতিবাদে বিক্ষোভ আন্দোলনে নেতৃত্ব নিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন। এবং বিশ্বের বিবেকী গণমানসের দরবারে এই বার্তাটা প্রতিদিন পৌঁছে দিচ্ছেন, যেটা বহু বছর আগে ডক্টর স্টকম্যান নামক জনৈক গণশত্রু উপলব্ধি করেছিলেন 'The strongest man is he who stands alone.'

ফিংকেলস্টাইনকে চমস্কি অভিহিত করেছিলেন একজন 'সৎ বুদ্ধিজীবী' হিসেবে। আজ অশোক মিত্রের প্রয়াণের পর তাঁর সম্বন্ধে স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে কিছুতেই এই বিশেষণটির বাইরে আর কিছু ভাবতেই পারছি না। ফিংকেলস্টাইনের মতোই অশোক মিত্রকেও যদি একটি বাক্যে সংজ্ঞায়িত করতে হয় তাহলে বলব, এমন একজন বুদ্ধিজীবী যিনি নিজের বিশ্বাসটুকুর জন্য গোটা জীবনটাকেই বাজি রেখেছিলেন। ১৯৭২ সালে ভারতবর্ষের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অরাজনৈতিক পদ, মানে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টার আসন ছেড়ে দিয়ে তিনি যখন পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন তখন তাঁর বয়েস পঁয়তাল্লিশও নয়। এবং তখন তাঁর কাছে কোনও চাকরিও ছিল না। কিন্তু তিনি জানতেন যে তাঁকে রাজনীতি করতে হবে। ওটাই একমাত্র রাস্তা। ইতিহাসের পরিহাসে সেই রাজনৈতিক দলটির সঙ্গেও তাঁর মতাদর্শগত বিরোধ হল। তিনি দলীয় রাজনীতির বাইরে চলে গেলেন ধীরে ধীরে। কেন্দ্র থেকে প্রান্তে, প্রান্ত থেকে আরো আরো অন্ধকার প্রান্তের দিকে। কিন্তু প্রান্তরের অমানিশা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর শাণিত কলমকে থামাতে পারেনি। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে শেষ নির্বাচনেও দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, 'দরকার পড়লে হামাগুড়ি দিয়ে ভোট দিতে যাব'। এই বাংলার ডক্টর স্টকম্যানের ভূমিকায় তাঁকে ছাড়া আর কাকেই-বা মানাবে।

তাঁর সঙ্গে আলাপচারিতার, এমনকী তাঁর পাঠাভ্যাস ও সাহিত্য-বিষয়ক আলোচনার মধ্যেও তাই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে ছিল রাজনীতি। কিন্তু রাজনীতি যেমন তার সাম্যবাদের সূচ্যাগ্র অভিমুখটিকে কখনো অনুদ্যত করেনি, আবার একইসঙ্গে সংকীর্ণ দলবাজির মালিন্যটুকুকেও সযত্নে গা থেকে ঝেড়ে ফেলেছে অনায়াসেই। 'আরেক রকম' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হবার সুবাদে তাঁর সঙ্গে আমার রাজনৈতিক কথোপকথন প্রায়ই

হত। কিন্তু যে অশোক মিত্র নিজস্ব বামপন্থার প্রশ্নে বিপক্ষকে একচুলও জমি ছাড়তে প্রস্তুত ছিলেন না, সেই তিনিই যখন সাহিত্যের অন্দরে আসতেন, হয়ে উঠতেন অনেক বেশি নমনীয়। লেনিন যেমন 'সর্বহারার সাহিত্য' নামক প্রলেটকুল্ট চিন্তাভাবনাটিকে তীব্র ব্যঙ্গে বিদ্ধ করেছিলেন, অশোকবাবু ততটা না হলেও 'সাম্যবাদী সাহিত্য' জাতীয় জিনিসপত্রকে কিছুটা সংশয়ের চোখে দেখতেন। এই বিষয়ে একটা ঘটনার কথা না বললেই নয়।

আরেক রকম-এ মার্কস ও সোভিয়েত নিয়ে আমার কয়েকটা লেখা ২০১৭ সালে কিছু বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল। সেই নিয়ে একদিন অশোকবাবু স্নেহ-মিশ্রিত শাসন করেছিলেন। মূলত প্রগল্‌ভতার কারণেই। তারপর বললেন, 'আপনাকে একটা অন্য কাজ দিচ্ছি। অনেক তো মার্কস নিয়ে লিখলেন। এবারে সাহিত্যে আসুন। দীনেশ দাশের 'এ যুগের চাঁদ হল কাস্তে' কবিতাটার শিরোনাম নিয়ে বুদ্ধদেব বসু তাঁর কবিতা পত্রিকাতে দুই বিপরীত মতাদর্শের কবি, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে-কে দুটি কবিতা লিখতে বলেছিলেন। ১৩৪৭ সনের কার্তিক সংখ্যাতে পিঠোপিঠি এই দুটি কবিতা বেরিয়েছিল। ওটা নিয়ে এখনকার পাঠক কী ভাবছে, সেটা আমি জানতে চাই। এখনও সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজম জিনিসটার সত্যিই কতটা আবেদন আছে, বোঝা দরকার। আপনি কবিতাদুটো নিয়ে লিখুন'। এই বলে কবিতা পত্রিকার একটি সংকলন আমার হাতে দিলেন। তারপর বললেন, 'আপনার যা মনে হয় সেটাই লিখুন। কিন্তু দেখবেন, সেটা পাঠককে যেন ভাবাতে পারে'।

তো, স্বভাবজাত আলস্যের কারণে কিছুদিন দেরি করছিলাম। একদিন ফোন করে বাড়িতে ডেকে একটু ধমক দিলেন। 'আপনি কি লিখবেন না ঠিক করেছেন? আমি কবে চলে যাব তার ঠিক নেই। যাবার আগে এই লেখাটা আমি দেখে যেতে চাই। ধরে নিন আমার এই ইচ্ছেটা শুধু ব্যক্তিগত চাওয়ার থেকে নয়। বরং দু-খানা বিস্মৃতপ্রায় কবিতাকে আবার বাংলার পাঠকের কাছে তুলে ধরে যদি কোনো প্রকারের মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ককে উসকে দেওয়া যায়, তাহলে সেইটুকু আমাদের বুদ্ধিচর্চার লাভ। কাজেই, আপনি তাড়াতাড়ি লিখুন'।

সেই লেখা লিখলাম। লেখা বেরোবার পর অশোকবাবুর বাড়িতে একটা অন্য কাজে গিয়েছি। কিন্তু উনি ভোলেননি। আমাকে বললেন, 'লেখাটা আমাকে পড়ে শোনান।' প্রসঙ্গত, উনি তখন চোখে দেখতেন না ভালো। তাই পড়ে শোনাতে হত। আমি শুরু করলাম, 'লেখাটার নাম দিয়েছি, 'এক হেমন্তে দুই কবি'। সঙ্গে সঙ্গে থামালেন। 'আপনি তাহলে বুদ্ধদেব বসু পড়েন?' শুনে ভাল লাগল। মানুষ তাহলে মনে রেখেছে?' বুঝলাম, ওনার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হলে কী হবে, স্মৃতি টনটনে। এবং মগজ এতই সজাগ যে বুদ্ধদেব বসু সেই কবে দস্তয়েভস্কি ও বোদলেয়ারকে নিয়ে 'এক গ্রীষ্মে দুই কবি' লিখেছিলেন, সেই রেফারেন্স টেনে বুদ্ধদেব সম্পাদিত পত্রিকারই দু-খানা কবিতা আলোচনা করেছি, এই অন্তর্নিহিত উইটটুকুও তাঁর নজর এড়ায়নি। যাই হোক, এরপর পুরো লেখাটা পড়লাম। লেখার মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ বিষ্ণু দের কবিতাদুটিও পুরোটাই তুলে দিয়েছিলাম। আমি যখন কবিতাগুলো পড়ছি দেখলাম অশোকবাবুর ঠোঁট নড়ছে। পুরো কবিতাটাই তিনি আমার সঙ্গে মুখস্থ বলে গেলেন। যখন লেখা শেষ হল, কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর অশোকবাবু বললেন, 'আমার ব্যক্তিগত ভাবে সুধীন্দ্রনাথের কবিতাটি বেশি পছন্দের'।

'কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ তো সাম্যবাদ বিষয়ে নিঃসংশয় আস্থা রাখতে পারলেন না। আকাশে কাস্তের মত চাঁদ দেখে তাঁর মনে বিভীষিকা ছাড়া আর কিছুই আসছে না'।

'সেটাকে আমি বিরাট প্রতিভার অপচয়ই মনে করি। কিন্তু অপচয়টুকু করতে গেলেও তো প্রতিভাটুকুকে লাগে। এখানে সুধীন্দ্রনাথ যে উপমার সাক্ষর রেখেছেন, এই যে, 'সমবায়ী অপরাস্তে', অথবা 'ছায়াপথে কোন অশরীরী উন্মাদ, লুকাল আস্তে আস্তে', এর তুলনীয় কিছু কি আমরা বামপন্থী শিবির থেকে সৃষ্টি করতে পারলাম?'

একটু থেমে অশোকবাবু আবার বললেন, 'হ্যাঁ, একটা কথা মানতেই হবে যে এই দুটি কবিতাই দীনেশ দাসের মূল কবিতার থেকে অনেকগুণে উৎকৃষ্ট'।

আমি চুপচাপ বসে বসে ভাবছিলাম, এটাকেই সম্ভবত মহৎ বুদ্ধিজীবীর লক্ষণ বলা যেতে পারে। যিনি নিজস্ব বিশ্বাসের জায়গাতে অটল থেকেই নন্দনতত্ত্বের প্রতি নিজের মতো করেই সৎ। তিনি জানেন যে সুধীন্দ্রনাথের সাম্যবাদ বিষয়ে সন্দেহ এবং অস্বস্তি আসলে বড়ো শিল্পীর দুঃখজনক পরিণতি। কিন্তু বিপরীত রাজনৈতিক মেরুতে দাঁড়িয়েও তিনি ওই বিশাল মাপের প্রতিভাটুকুকে কুর্নিশ জানাতে দ্বিধা করেন না। ভাবতে ভালো লাগছিল যে সমস্ত রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত বিতর্কের পরে গিয়েও দিনের শেষে মহারথী প্রতিভাবানেরা একটা আলাদা বুদ্ধিচর্চার সারিতে থাকেন, যেখানে একে অপরের বিশালত্বের প্রতি ঔদার্যময় মাথা নত করাটা আসলে তাঁদের কুণ্ঠাহীন হৃদয়বেত্তারই পরিচায়ক।

বস্তুত, ভাষার নন্দন-আনন্দ এবং অলংকারময় কাব্য-সুষমার উপর রাজনৈতিক অঙ্গুলিহেলন বিষয়ে তাঁর অস্বস্তি 'কবিতা থেকে মিছিলে' বইটি পড়লেই বোঝা যাবে। 'একটি ভাষা সমস্যা প্রসঙ্গে' নামক প্রবন্ধে তিনি সরাসরিই বলেছেন যে সোভিয়েত আমলে পার্টির হস্তক্ষেপে সাহিত্যের অঙ্গন থেকে ভাষার নান্দনিকতা নামক বোধটি হারিয়ে যাচ্ছিল। এই প্রসঙ্গে

আরেক রকম সম্পাদনার সময়ে ওঁর সঙ্গে একদিন বাড়িতে একটা হালকা বিতর্ক হয়েছিল। যে কবিতা লিখবে, সে কি রাজনীতি করবে না? নাকি স্লোগান-সর্বস্ব কবিতা লেখাটাই তার জীবনের নিয়তি? অশোকবাবুর মতামত ছিল, সুকান্ত ভট্টাচার্য বেঁচে থাকলে যদি সক্রিয় রাজনীতি করতেন, তাঁর কবিতা ঝুলে যাবার প্রভূত সম্ভাবনা ছিল। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উদাহরণ টেনে বলেছিলেন, রাজনীতির ঘোরপ্যাঁচ প্রকৃত শিল্পকে নষ্ট করে দেয়। এই দোষে আমাদের কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাহিত্য ডুবেছে। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাহলে মায়াকভস্কি? অথবা অক্টাভিও পাজ? উনি উত্তর দিয়েছিলেন, মায়াকভস্কি সক্রিয় রাজনীতি করেননি। বুঝতেনও না। তারপর আঁদ্রে মালরোর উদাহরণ টানলেন। মালরো মন্ত্রী হবার পরে তাঁর হাত দিয়ে একটিও মনে রাখার মতো কাজ আর বেরোয়নি। আমি সেদিন তাঁর কথায় নিঃসংশয় আস্থা রাখতে পারিনি। সেই তর্কটার আর নিষ্পত্তি হল না, জীবনের আর সবকিছুর মতোই।

এবং এই সূত্রে বার বার যেটা মনে হত, অন্তত বাংলা কবিতা বিষয়ে অশোকবাবুর পাঠ কিছুটা আর্কাইক। বুদ্ধদেব বসু অথবা নরেশ গুহ বিষয়ে যিনি এত কথা বলছেন, তিনি তাঁরই প্রায় সমসাময়িক শক্তি, সুনীল, উৎপলকুমার বসু, অথবা কিছুটা পরবর্তীকালের ভাস্কর চক্রবর্তী বিষয়ে এতটা নীরব কেন? এঁদের কবিতা তাঁর মতো তন্নিষ্ঠ পাঠক পড়েননি এ প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। আমি একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার বিষয়ে। অশোকবাবু হাত উলটে একটু ভাসা ভাসা উত্তর দিলেন। বুঝলাম, খুব একটা উৎসাহী নন। সম্ভবত চল্লিশ-পঞ্চাশের লিরিকাল কাব্যসুষমাময় ধারাটির নস্টালজিয়া থেকে তিনি কখনো মুক্ত হতে পারেননি। একই ব্যাপার ছিল সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কেও। ব্যক্তি সুভাষ সম্পর্কে কিছুটা বিরূপ ধারণা তিনি পোষণ করতেন, সেটা রাজনৈতিক কারণেই। এছাড়াও সুভাষের জীবনের প্রথম পর্বের পদলালিত্য ঝংকারময় লিরিকাল কবিতাগুলি যতখানি ডক্টর মিত্র-র প্রিয় ছিল, পরবর্তীকালে বজবজ মহেশতলা অঞ্চলের শ্রমিকজীবন নিয়ে যখন সুভাষ গদ্যকবিতা লিখতে শুরু করলেন, অশোকবাবু সেগুলোকে ততখানিই অপছন্দ করলেন। একটা কারণ শুধুমাত্র রাজনৈতিক না-ও হতে পারে। বরং একে পাঠের সীমাবদ্ধতা হিসেবে অভিহিত করা ভুল হবে না।

প্রচুর কথা হয়েছিল সমর সেনকে নিয়েও। আমার বিশেষ কৌতূহল ছিল, ভিন্ন মতবাদের মানুষ হয়েও কীভাবে অত দীর্ঘদিন দুজন একসঙ্গে ঘর করলেন। তো, অশোকবাবু যেটা বলতেন, সমর সেন স্পষ্ট মুখেই অশোক মিত্র-র রাজনৈতিক মতামত সম্পর্কে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করতেন। কিন্তু লিখতে একফোঁটাও বাধা দিতেন না। এমনকী অশোকবাবুর সিপিআই (এম)-পন্থী লেখাও অকাতরে লিখতে দিতেন। তবে জরুরি অবস্থার সময়ে একবার বলেছিলেন, 'আরে মশাই, আপনার এসব লেখাপত্রের জন্যই আমার কাগজ এবার লাটে উঠবে!' তবে অশোক মিত্র-র সম্ভবত ব্যক্তি সমর সেন সম্পর্কে কিছু রিজার্ভেশন থেকে থাকবে। এটা প্রায়ই বলতেন যে তিনি সমর সেনের বন্ধুবৃত্তে কখনো থাকেননি। অশোকবাবুর মতে, সমর সেন প্রচণ্ড জটিল চরিত্র, এবং চাপা স্বভাবের। কাউকে বিশ্বাস করতেন না। নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে একটাও কথা বলতেন না।

এই প্রসঙ্গে একটা মজার ঘটনা, যেটা প্রায়ই শুনেছি ওঁর মুখে। অশোক মিত্র ফ্রন্টিয়ারে চারণ গুপ্ত ছদ্মনামে লিখতেন। স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসারেরা বহুদিন তক্কে তক্কে ছিলেন, কে এই চারণ গুপ্ত, তাঁকে একদিন ঠিক পাকড়ও করবেনই। আবার, এক শ্রেণির অফিসারের ধারণা ছিল, চারণ গুপ্ত ছিলেন পুলিশের তখনকার বড়বাবু রঞ্জিত গুপ্ত-র ভাই! অশোকবাবু প্রায়ই হাসতে হাসতে এই গল্প করতেন, এবং শেষ করতেন এই বলে যে 'রাষ্ট্রক্ষমতা, পুলিশ এদের আমরা যতখানি বুদ্ধিমান ভাবি, এরা তার থেকেও বেশি ইমবেসাইল'।

আর একটা ঘটনা প্রায়ই বলতেন। এটা সম্ভবত আপিলা চাপিলা-তেও ছিল। সমর সেন একদিন একটা পার্টিতে জ্যোতি বসুর সঙ্গে একটু উত্তপ্ত তর্ক করেছিলেন। তখন বামফ্রন্ট (অথবা ১৯৬৭-র যুক্তফ্রন্ট। স্মৃতির এহেন বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী) এসে গেছে এবং সমর সেন সিপিআই (এম)-বিরোধী বাম হিসেবে নিজের অবস্থানে সুবিখ্যাত। তো, সেই পার্টিতে সমর সেনের হাতে পানীয়-র গ্লাস। কী একটা প্রসঙ্গে সরকারের সমালোচনা করেছিলেন। জ্যোতিবাবু প্রথমে পাত্তা দিচ্ছিলেন না। এরপর হঠাৎ একটু তির্যকভাবেই কিছু একটা কথা বলে বসলেন সমরবাবু। জ্যোতি বসু ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন 'দেখুন, হাতে স্কচের গ্লাস নিয়ে রাজনীতির কথা বলবেন না। কাল সকালে সুস্থ হয়ে আসুন, আপনার সব কথা শুনব'। অশোকবাবু বললেন, এই কথাটা শোনবার পরেই সমর সেন চুপ করে গেলেন। আর কথা বাড়াননি।

তবে, অশোক মিত্র-র কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে উচ্চতম প্রশংসা ছিল 'চরিত্রবান মানুষ'। যে মানুষ নিজের বিশ্বাস এবং আদর্শে অটল, এবং বাইরের শত প্রলোভনেও মাথা নত করেননি কখনো, তাঁদের তিনি এই বিশেষণে ভূষিত করতেন। তিন জনের সম্বন্ধে এই বিশেষণ প্রয়োগ করতে তাঁকে বার বার দেখেছি। সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় (সমস্ত রকম রাজনৈতিক বিরূপতার পরেও) এবং জ্যোতি বসু। সমর সেন নিজের তাত্ত্বিক অবস্থানে যে একশো শতাংশ সৎ থেকেছেন,

এবং চূড়ান্ত অর্থকষ্টের মধ্যেও কখনো নতজানু হননি, এই জিনিসটা অশোকবাবুর শ্রদ্ধা অর্জন করে নিয়েছিল। এই লেখার শুরুতেই সৎ বুদ্ধিজীবী এবং ফিংকেলস্টাইনের যে কাহিনিটি লিখেছি, সেটা কেন অশোক মিত্র-র সম্বন্ধে আলোচনায় প্রাসঙ্গিক সেগুলো এসব ঘটনা থেকে কিছুটা বোঝা সম্ভব।

কিন্তু সাহিত্যপাঠ বিষয়ে সর্বদা তাঁর মননের সহযাত্রী হতে পারিনি। অশোকবাবুর আত্মার সঙ্গী ছিল রবীন্দ্রনাথের কবিতা। প্রায়ই রবীন্দ্রনাথ থেকে তিনি কবিতার উদ্ধৃতি দিতেন। রবীন্দ্রনাথ নিয়ে আমি উদাসীন থাকবার কারণে সেই রসাস্বাদন সম্ভব হয়নি সবসময়। আবার আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে জীবনানন্দ দাশ হলেন বাংলার শ্রেষ্ঠ গদ্যকারদের মধ্যে প্রথম সারিতে। অশোকবাবু জীবনানন্দকে গদ্যশিল্পী হিসেবে পাত্তা দিতেন না। আমাকে একবার বলেছিলেন, 'আপনি যে আপনার লেখাতে জীবনানন্দ দাশের গদ্য নির্মাণ নিয়ে এত উচ্ছ্বসিত, কালীকৃষ্ণবাবুকেও (কবি কালীকৃষ্ণ গুহ, *আরেক রকম* পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য) দেখি জীবনানন্দ দাশের উপন্যাসের কথা খুব বলেন, কিন্তু আমার তো ওগুলো কিস্যু হয়নি বলেই মনে হয় বার বার। তাঁর গদ্যভাষা জটিল এবং কোথাও কোথাও গন্তব্য নেই কোনো উপন্যাসের। আপনার কি ধারণা জীবনানন্দ কোনও মহৎ সৃষ্টির তাড়নায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে ওগুলো লিখেছিলেন? আমার তো ফ্রাস্ট্রেশনের ফসল বলে মনে হয়।' আমি কিছুটা তর্ক করেছিলাম। আবার মাঝে মাঝেই অন্নদাশংকর রায়ের কবিতাগুলি অশোকবাবু আমাকে দিয়ে পড়াতেন। একটা কবিতা ছিল, ছড়ার ধরনে লেখা, 'চটি ফটফট চাটুজ্জে, মুখ মকমক মুখুজ্জে'। কমিউনিস্ট ভদ্রলোক নেতাদের নিয়ে কিছু তির্যক মন্তব্য ছিল লেখাটায়। অশোকবাবুর বক্তব্য ছিল এই কবিতাটা অসাধারণ এবং কয়েক দশক আগেই অন্নদাশংকর রায় দিব্যদ্রষ্টার মতো দেখতে পেয়েছিলেন বাবু-শ্রেণির কমিউনিস্টদের অধঃপতন। আমার কবিতাটা ব্যক্তিগতভাবে খুবই সাধারণ লেগেছিল। আর কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে ভদ্রলোক শ্রেণির প্রাধান্য বিষয়ে পড়তে গেলে এই ছড়াটি পড়ব কেন? ঋত্বিক ঘটক অথবা চিন্মোহন সেহানবিশের সমালোচনাগুলোকে কেন দেখব না? সেগুলো তো শিল্পগতভাবেও অনেক বেশি গুণসম্পন্ন! কিন্তু এই কথাগুলো বলা হয়নি। অশোকবাবুর বাংলা কবিতা ও সাহিত্য বিষয়ে ভালোবাসা ছিল অকৃত্রিম। সেই আবেগ দিয়ে দেখতে গেলে হয়তো অনেকের সঙ্গেই মতে মিলবে না। কিন্তু তাঁকে অস্বীকার করবারও মানে হয় না। তবে এই প্রশ্নটা বার বার মনে জাগে। যিনি পামুকের 'মাই নেম ইজ রেড' অথবা মিহির সেনগুপ্তের 'বিষাদবৃক্ষ'-র অত তন্নিষ্ঠ পাঠক ছিলেন, তিনি কেন বাংলা কবিতা অথবা উপন্যাসের একদম সাম্প্রতিক পরীক্ষানিরীক্ষাগুলি নিয়ে কিছুটা হলেও উদাসীন রইলেন?

তাঁর জীবদ্দশায় *আরেক রকম*-এর শেষ সম্পাদকীয় বৈঠক আলিপুর পার্কের বাড়িতে হয়েছিল, মার্চ মাসে। মিটিং-এর শেষে বলেছিলেন, 'আমার বাড়িতে এটাই শেষ সম্পাদকীয় বৈঠক। সামনের সপ্তাহ থেকে আমি নার্সিং হোমে চলে যাচ্ছি। ফিরব কিনা জানি না। আপনাদের সকলকে নমস্কার জানাচ্ছি'।

আমরা এক এক করে বেরিয়ে আসছিলাম বইতে ঠাসা ঘর থেকে। শেষে ছিলাম আমি। একবার পেছন ফিরে দেখলাম, একটা রোগা বৃদ্ধ শরীর নিঝুম হয়ে বসে আছে। একলা। বাইরে অন্ধকার নেমে আসছিল তখন। আমার হঠাৎ মনে পড়ল, তাঁর সঙ্গে দ্বিতীয় আলাপের দিনও এই ঘরে বসেছিলাম। তখন শীতকাল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'বাইরে কি ঠান্ডা পড়েছে? রোদ আছে এখনও?' 'হ্যাঁ, ঠান্ডা পড়েছে ভালোই। অন্ধকার হয়ে আসছে'।

একটু থেমে অশোকবাবু বললেন, 'আমি তো আর বাইরে যেতে পারি না। কী ঘটছে কিছুই জানি না'।

আমি দেখেছিলাম অন্য এক অন্ধকার নেমে আসছে নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ কমিউনিস্টের চোখে।

আর শেষ দিন, যখন সেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসছি, আবারও দেখলাম, বাংলার ফিংকেলস্টাইন এক নীরব অন্ধকারের মধ্যে ধীরে ধীরে নিজেকে একলা করে নিচ্ছেন। পৃথিবীর শেষ কমিউনিস্ট। একটা বদলে যাওয়া আপোশকামী পৃথিবীতে নিঃসঙ্গ, নন-কনফর্মিস্ট অবস্থানে অনড় থাকতে থাকতে যিনি হঠাৎ আবিষ্কার করলেন, তাঁদের মতো সৎ বুদ্ধিজীবীদের সময় আজ শেষ। এবার আসছে বামনদের রাজত্ব। আলো যে সত্যিই ক্রমে আসিতেছে, সেটা কমরেড অশোক মিত্র-র থেকে বেশি আর কেই-বা অনুভব করবে?

আপোশহীন অশোক মিত্র

শুভনীল চৌধুরী

গোটা দেশজুড়ে মূল্যবোধের অবক্ষয়। রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে তস্করদের পার্থক্য অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে খুঁজে বার করতে হয়। সমাজে এক অদ্ভুত অরাজকতা, আদর্শহীনতা। রাজনীতির আঙিনায় লুম্পেনদের দাপাদাপি। অর্থব্যবস্থার অবস্থা তথৈবচ— গরিব ক্রমে গরিবতর, ধনী আরো ধনবান। বাড়তে থাকা আর্থিক বৈষম্য সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে, প্রতিনিয়ত শোনা যাচ্ছে সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদের ভয়াবহ হুংকার, দেশজুড়ে সংখ্যালঘু, দলিত মানুষের উপরে নামিয়ে আনা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। যেই বামপন্থীদের এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মোকাবিলায় সামনের সারিতে থাকার কথা, তারা নিজেদের বিচ্যুতি, অক্ষমতা ও দম্ভের ফলে মানুষের থেকে বহু দূরে সরে গিয়েছেন। এমতাবস্থায়, দেশ, সমাজ, রাজনীতির গতিপ্রকৃতি অদৃষ্টের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজের চরকায় তেল দেওয়ায় লোকের অভাব নেই।

কিন্তু অশোক মিত্র ছিলেন অন্য ধাতুতে গড়া মানুষ। জীবনের আটটি দশক পার করার পর বুদ্ধিজীবী হিসেবে নতুন কিছু প্রমাণ করার প্রয়োজন তাঁর ছিল না। সক্রিয় রাজনীতি ছেড়ে চলে এসেছেন বহু বছর আগে। কিন্তু সমাজ, রাজনীতি, বামপন্থার এই অবক্ষয়ের মধ্যে চোখ বুজে থাকা বাদ দিয়ে আর কিছু করার নেই, এই মতামত তিনি মানতে পারেননি। অসমর্থ শরীরেও শুরু করলেন 'আরেক রকম' পত্রিকা, যা অন্তত চিন্তার জগতে, মানুষের মননে প্রশ্ন সঞ্চারিত করবে, বিতর্ক গড়ে তুলবে এই ভয়াবহ পরিস্থিতির থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় নিয়ে, মানুষের কাছে নিয়ে যাবে সেই বার্তা, যে অন্ধকার কখনো চিরকালীন হতে পারে না, আলো খুঁজে নেওয়ার দায়িত্ব মানুষকেই নিতে হবে। এই পত্রিকাকে নিজের হাতে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অশোক মিত্র জীবনের সায়াহ্নে, অসুস্থ শরীর নিয়েও যে ভূমিকা পালন করেছেন, স্বচ্ছ, বাম গণতান্ত্রিক চিন্তা, বাম আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে কঠোর পরিশ্রম করেছেন, তার জুড়ি মেলা ভার।

অশোক মিত্রের গোটা জীবন ছিল বাম আদর্শ ও প্রগতিশীল রাজনীতির জন্য সমর্পিত। মাত্র ৩৮ বছর বয়েসে তিনি দেশের কৃষিপণ্য মূল্য কমিশনের শীর্ষে, তারপরে ৪২ বছর বয়সে তিনি ইন্দিরা গান্ধী সরকারের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তার দু-বছরের মাথায় পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের নেতৃত্বে সেই সময়ে যে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নামিয়ে আনা হয়, ১৯৭২ সালের নির্বাচনে যেভাবে রিগিং করে ক্ষমতা দখল করা হয়, তার প্রতিবাদে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের উপদেষ্টা পদ থেকে পদত্যাগ করেন। আজকে বামপন্থীদের মধ্যে কংগ্রেসপ্রীতি তাঁর প্রবল পীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এরপরে, অশোক মিত্র প্রথম ও দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকারের অর্থমন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন প্রায় ৮ বছর। সেই সময়ে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের নেতৃত্বে গ্রামীণ এলাকায় ভূমি সংস্কার এবং অপারেশন বর্গার মতন যে প্রগতিশীল কর্মকাণ্ড সংগঠিত হয় তাতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত বামপন্থী উদ্যোগের পিছনে ছিল তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান, যা গোটা দেশের নজর কেড়েছিল। কিন্তু বামফ্রন্টের কিছু নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়ে যখন তাঁর সঙ্গে মতানৈক্য হয়, তখন আবারও তাঁর আপোশহীন মননের পরিচয় দিয়ে তিনি মন্ত্রীত্ব এবং দল থেকে পদত্যাগ করেন। আজকের রাজনীতিতে আপোশ করাই দস্তুর। নেতা যা বলে দেবে তা মুখ বুজে মেনে নেওয়াই রেওয়াজ। রাজনৈতিক কেরিয়ারের থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কিছু যেখানে নেই, যেখানে আদর্শ কেন, ক্ষমতায় টিকে থাকতে হলে আরো অনেক কিছুই জলাঞ্জলি দেওয়া যায়, সেখানে অশোক মিত্র আদর্শের জন্য, নিজের নীতিগত অবস্থানের তাগিদে ক্ষমতার অলিন্দ থেকে সরে আসতে দ্বিধা করেননি, আপোশ করেননি।

বামপন্থী নীতির প্রতি তাঁর এই আপোশহীন অবস্থান, মেরুদণ্ড সোজা রেখে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার দৃষ্টান্তগুলি আমাকে ছোটোবেলা থেকেই আকর্ষণ করেছিল। বিশেষ করে মনে আছে তাঁকে প্রথম দেখার মুহূর্তটি। ১৯৯০-

এর দশকের শেষের দিকের ঘটনা। আমি তখন সদ্য বামপন্থী আদর্শে আকৃষ্ট, বাম ছাত্র-আন্দোলনের কর্মী হব হব করছি। এমতাবস্থায় অশোক মিত্র বক্তৃতা দিতে এলেন আমাদের অঞ্চলে, নেতাজিনগরের মিলন সমিতি ক্লাবে। বক্তৃতার বিষয় কী ছিল এখন আর মনে নেই। কিন্তু সেদিন তিনি অনেক কথার মধ্যে বলেছিলেন যে বামপন্থীদের মধ্যে, বিশেষ করে বামফ্রন্টের বড়ো দলটির নেতৃত্বের মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব রয়ে গেছে। শুনে আমরা হকচকিয়ে গেছি। উনি বলেন কী? মার্কসবাদে দীক্ষিত দলের নেতৃত্বের মধ্যে সামন্তবাদের ঘুণ? তাঁর এই কথা আমাদের অনেকেরই পছন্দ হল না, প্রশ্নও করে ফেললাম। তিনি মৃদু হেসে আমাদের বোঝালেন যে দীর্ঘ দিনের শ্রেণি অভ্যাস, ক্ষমতায় অনেকদিন থেকে যাওয়ার ফলে আবারও থাবা বসাচ্ছে, অতএব সাধু সাবধান! সত্যি বলতে কী, আমরা সেদিন তাঁর কথা যে মন থেকে মেনে নিয়েছিলাম তা নয়। সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ স্বপ্নালু তরুণের দল, বুঝতে পারিনি কোন প্রজ্ঞা থেকে তিনি তাঁর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। পরে, সক্রিয় বাম রাজনীতি করতে গিয়ে অনেক নেতাদের সংস্পর্শে এসে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি, সেদিন অশোক মিত্র কী ভীষণ সত্য কথা আমাদেরকে বলে গিয়েছিলেন!

অর্থনীতির ছাত্র হয়ে দিল্লি পাড়ি দিলাম। সেই সময়েই তাঁর অর্থনীতি সংক্রান্ত গবেষণার কাজ, বিশেষ করে 'Terms of Trade and Class Relations in India' পড়লাম, মুগ্ধ হলাম। ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের সক্রিয় কর্মী ছিলাম। বেশ কয়েক বার অশোক মিত্র আমাদের সভায় বক্তৃতা করতে আসেন। একবার, কোনো এক সেমিনারের জন্য তাঁর দিল্লি আগমন। বিমানবন্দর থেকে তাঁকে নিয়ে যথাযথভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথিশালায় পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আমার। গাড়িতে ওনার সঙ্গে প্রথম আলাপ। খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কী পড়ি, কোথায় বাড়ি, কোন মাস্টারমশাইয়ের কাছে গবেষণা করছি, ইত্যাদি। সেই সেমিনারের আরেকটি গল্প ভারি মজার। বক্তৃতা শেষে চা বিরতিতে সবাই গল্পগুজব করছে। আমার এক বন্ধু গজগজ করছে যে সব ঠিক আছে, কিন্তু অশোক মিত্র কেন পশ্চিমবাংলায় প্রাথমিকে ইংরেজি শিক্ষা তুলে দিলেন। আমি একটু মজা করে ওকে বললাম, সোজাসুজি অশোক মিত্রকেই প্রশ্নটি করতে। ভেবেছিলাম, অতটা বোধহয় ওর সাহসে কুলোবে না। কিন্তু, না, ছেলে নাছোড়বান্দা। সোজা তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'প্রাথমিকে ইংরেজি শিক্ষা তুলে দিলেন কেন?' আমরা কোথায় মুখ লুকোব ভাবছি। দেখলাম, অশোক মিত্র অবিচল। তিনি খুব সুন্দরভাবে বোঝালেন কেন তিনি সেই সুপারিশ করেছিলেন। বুঝলাম, আপাতদৃষ্টিতে রুক্ষ মনে হলেও, তাঁকে ন্যায্য প্রশ্ন করলে তিনি তার যথাযথ জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেন।

আমাদের প্রজন্মের সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র-গবেষক এবং বাম-কর্মীদের মধ্যে অশোক মিত্রের চিন্তাভাবনার গভীর প্রভাব অবশ্য পড়েছিল পশ্চিমবঙ্গে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম পর্বের সময়। ওই ঘটনাগুলি ঘটার আগেই, ২০০৬ সালের নির্বাচনে বামফ্রন্টের বিপুল জয়ের পরে ইপিডব্লু জার্নালে লেখা একটি প্রবন্ধে তিনি দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙ্গড় এবং হাওড়া জেলার দুটি বিধানসভায় বাম প্রার্থীরা পরাজিত হওয়ার কারণ হিসেবে সেখানে কর্পোরেট পুঁজির জন্য জমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে অসন্তোষকেই চিহ্নিত করেছিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বাম সরকারকে ভেবেচিন্তে পদক্ষেপ নিতে এবং বাম আদর্শের প্রতি অবিচল থেকে সরকার পরিচালনা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তা যদি না হয়, তবে প্রবল প্রতিরোধ হবে বলে আগাম সতর্ক করেছিলেন।

কিন্তু রাজ্যের সর্বোজ্ঞ বাম নেতৃত্ব তখন ২৩৫ আসন পাওয়ার দম্ভে তাঁর সতর্কবাণী শুধু উপেক্ষাই করলেন না, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম পর্ব থেকে শুরু করে একের পর এক ভুল করতে লাগলেন। অশোক মিত্র বার বার চোখে আঙুল দিয়ে সেই ভুলগুলি ধরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সেই সময়ে তাঁর সমালোচনা গ্রহণ করা হয়নি, উপরন্তু তাঁর মতের বিপরীতে পার্টির পত্রিকাতে অনেকেই কলম ধরেন। বামপন্থা থেকে বিচ্যুত হয়ে অবশেষে ২০১১-তে বাম সরকারের অবসান ঘটল। তার পরেও কিন্তু অশোক মিত্রের সমালোচনাকে পার্টির পক্ষ থেকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয়নি।

বামপন্থীদের বিচ্যুতির আরো একটি নিদর্শন ছিল ২০১২ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কংগ্রেস সরকারের অর্থমন্ত্রীকে সমর্থন করা। অশোক মিত্র আগেই কংগ্রেস প্রার্থীকে সমর্থন না করার জন্য বামপন্থীদের আবেদন জানিয়েছিলেন। সেই মতকেও উপেক্ষা করা হয়েছিল। সেই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে পার্টির গবেষণা শাখার আহ্বায়ক দল ছাড়লেন। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠনকে ভেঙে দেওয়া হল, এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করায়। এই উথালপাথাল অবস্থায়, অশোক মিত্র সংহতি জানিয়েছিলেন জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের বহিষ্কৃত ছাত্রকর্মীদের প্রতি। একটি বার্তায় তিনি বলেছিলেন:

> There is just one word of encouragement I want to convey to my young friends at Jawaharlal Nehru University. If you have searched your conscience and it has endorsed your judgement that what you are embarking upon is in defence of your cherished ideology and you are prepared to go all the way to face the consequences of

> your decision, please do go ahead. It has happened so often in history that elders leading a movement have made mistakes which the juniors through their initiative have got reversed. But they had to go through intense sufferings... The battle to protect the purity of the ideology can never be a lost cause; the final victory is bound to be ours.

বলাই বাহুল্য, বাম নেতৃত্বের মধ্যে তিনি আরো একবার অপ্রিয় হয়েছিলেন, কিন্তু নিজের অবস্থানে তিনি অবিচল থেকেছেন।

জনগণের আদালতে প্রতিনিয়ত পার্টিকে পরীক্ষা দিতে হয়েছে। এবং প্রত্যেকবার প্রমাণিত হয়েছে যে অশোক মিত্রের সতর্কবার্তাগুলি কতটা সঠিক ছিল। ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত, ২০০৯ সালের লোকসভা, ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে উপর্যুপরি পরাজয়ের পর ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনেও বামফ্রন্টের ভরাডুবি হল। আমি নেতৃত্বের ভুলভ্রান্তির প্রতিবাদ জানালাম, দাবি জানালাম যে মতাদর্শগত বিচ্যুতি এবং এই বিপুল হারের দায়িত্ব নিয়ে নেতৃত্বের সরে দাঁড়ানো উচিত। নেতৃত্ব আমাকে বহিষ্কার করল। গেলাম অশোক মিত্রের কাছে। নেতৃত্বের বিচ্যুতির সমালোচনা করে আমার লেখা নিবন্ধ যত্ন নিয়ে 'আরেক রকম' পত্রিকায় ছাপলেন। আবারও কলম ধরলেন বামেদের বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লিখলেন:

> What is farcical, those within the party who vocally speak for immediate reform and restructuring of the state leadership are being thrown out of the party: some of those who themselves deserve to be excluded from the party and its leadership sit in judgement, expelling those who want to save the party, its ideals and its traditions to mobilize the oppressed people against the exploiting classes. ('Telegraph', 28 May, 2014)

> দলের অভ্যন্তরেও বিক্ষোভের ঢেউ। কিন্তু দলীয় অনুশাসনের কঠোরতার জন্য অনেকেই মুখ ফুটে স্পষ্ট কথা বলতে পারছিলেন না, যাঁরা পারছিলেন তাঁদের নেতারা সরিয়ে দিলেন দল শুদ্ধিকরণের অজুহাতে। দলকে পরিশুদ্ধ করতে হলে যাদের যাওয়া প্রয়োজন তাঁরা কিন্তু থেকে গেলেন; যাঁরা রাজ্যের মানুষের স্বার্থে, আদর্শের স্বার্থে, আন্দোলনের স্বার্থে, নেতৃত্বের পুনর্গঠন চাইছিলেন, তাঁরাই বহিষ্কৃত হলেন।' ('আরেক রকম' ১-১৫ জুন, ২০১৪)

জনগণের দরবারে বার বার প্রত্যাখাত হলেও, নিজেদের বিচ্যুতিগুলিকে সাদা মনে স্বীকার করে সেগুলি সংশোধন করে নেওয়ার জন্য যে সৎসাহস এবং শুভবুদ্ধির প্রয়োজন, তা পার্টির নেতাদের ছিল না। তাই তাঁরা আবার বিপথগামী হলেন, ভাবলেন কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করলেই তৃণমূলের মতন একটি জনবিরোধী দল ও সরকারকে হারানো যাবে। 'আরেক রকম'-এর পাতায় বার বার অশোক মিত্র কংগ্রেসের সঙ্গে সুবিধাবাদী জোটের বিরোধিতা করেছেন। বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে এইভাবে হবে না, শাসক শ্রেণির পার্টির হাত ধরে কখনো লাল পতাকাকে উড্ডীন রাখা যায় না। কে শোনে কার কথা। ২০১৬ সালের নির্বাচনে জোট হল। সেই জোটের সমালোচনা করলেও তিনি তাঁর কর্তব্য থেকে বিচলিত হননি। 'হামাগুড়ি দিয়ে হলেও', তৃণমূল কংগ্রেসের স্বৈরাচারী নেত্রীর বিরুদ্ধে গিয়ে ভোট দিয়ে এলেন। কিন্তু তাই বলে বামপন্থীদের বিচ্যুতির সমালোচনা করতে তিনি পিছপা হননি। এবং যা আশঙ্কা করা হয়েছিল, তাই হল, বামফ্রন্টের আরো শক্তি ক্ষয় হয়ে তারা তৃতীয় স্থানে চলে গেল। আরো অনেকেই পার্টির প্রতি বিমুখ হলেন।

ক্রমাগত এই বিচ্যুতিগুলির দরুণ জনগণের দরবারে বার বার পরাজিত হয়েও, উপযুক্ত শিক্ষাগ্রহণ না করার ফলে আজ পার্টি এই রাজ্যে অবলুপ্তির পথে যেতে বসেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে বামপন্থীরা আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হওয়ায় সাম্প্রদায়িক দল বিজেপি-বিরোধী রাজনীতির পরিসর দখল করে নিচ্ছে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বাড়বাড়ন্ত চারিদিকে। এই নিদারুণ পরিস্থিতিতে অশোক মিত্র আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। রেখে গেছেন সমস্ত বামপন্থীদের কাছে আদর্শে অবিচল থাকার অনুপ্রেরণা। পার্টির কাছে, বামফ্রন্টের কাছে দিয়ে গেছেন ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের বার্তা। সেই বার্তা গ্রহণ করে কোনো যথাযথ পদক্ষেপ তাঁরা নেবেন কি না, রাজ্যের মানুষ সেটা অবশ্যই দেখবে।

পশ্চিমবঙ্গে বুদ্ধিজীবী শব্দটির প্রতি আজকাল মানুষের অশ্রদ্ধা জন্মেছে কারণ বিগত কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে যে যাদের জনগণ বুদ্ধিজীবী বলে জানে, তারা নির্লজ্জভাবে সরকারের তোষামোদ করতে ব্যস্ত। আবার, বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে পার্টির প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্য। বামপন্থার স্খলন ধরিয়ে দিতে তাঁরা অনেকেই পিছপা হয়েছেন অথবা নানান তাত্ত্বিক কচকচানির মোড়কে সেগুলিকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু অশোক মিত্র ছিলেন ভিন্ন গোত্রের মানুষ। তিনি সর্বদা প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্প্রদায়িক, স্বৈরাচারী, জনবিরোধী শক্তিগুলির বিরুদ্ধেও যেমন জোরালো আওয়াজ তুলেছেন, বামপন্থী সহযাত্রীদের বিপথগামিতা, তাদের ভুলত্রুটিগুলি চিহ্নিত করতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি, কারণ তিনি দায়বদ্ধ ছিলেন সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষ ও তাদের মুক্তির আদর্শ, মার্কসবাদের প্রতি।

নোয়াম চমস্কি একটি নিবন্ধে লিখেছেন যে বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব সত্য কথা বলা এবং মিথ্যার পর্দা ফাঁস করা ('It is the responsibility of intellectuals to speak the truth and to expose lies')। অশোক মিত্রের জীবন এই বার্তাকেই সার্থকতা প্রদান করেছে। আজীবন তিনি সত্য বলে গেছেন, ক্ষমতার চোখরাঙানিকে ভয় না পেয়ে। তাঁর এই বিরল সংগ্রামী জীবন আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রেরণা জোগাবে। তাদের শেখাবে, কীভাবে আদর্শের অবৈকল্য, নীতির প্রতি অঙ্গীকার গোটা জীবনের পাথেয় করা সম্ভব।

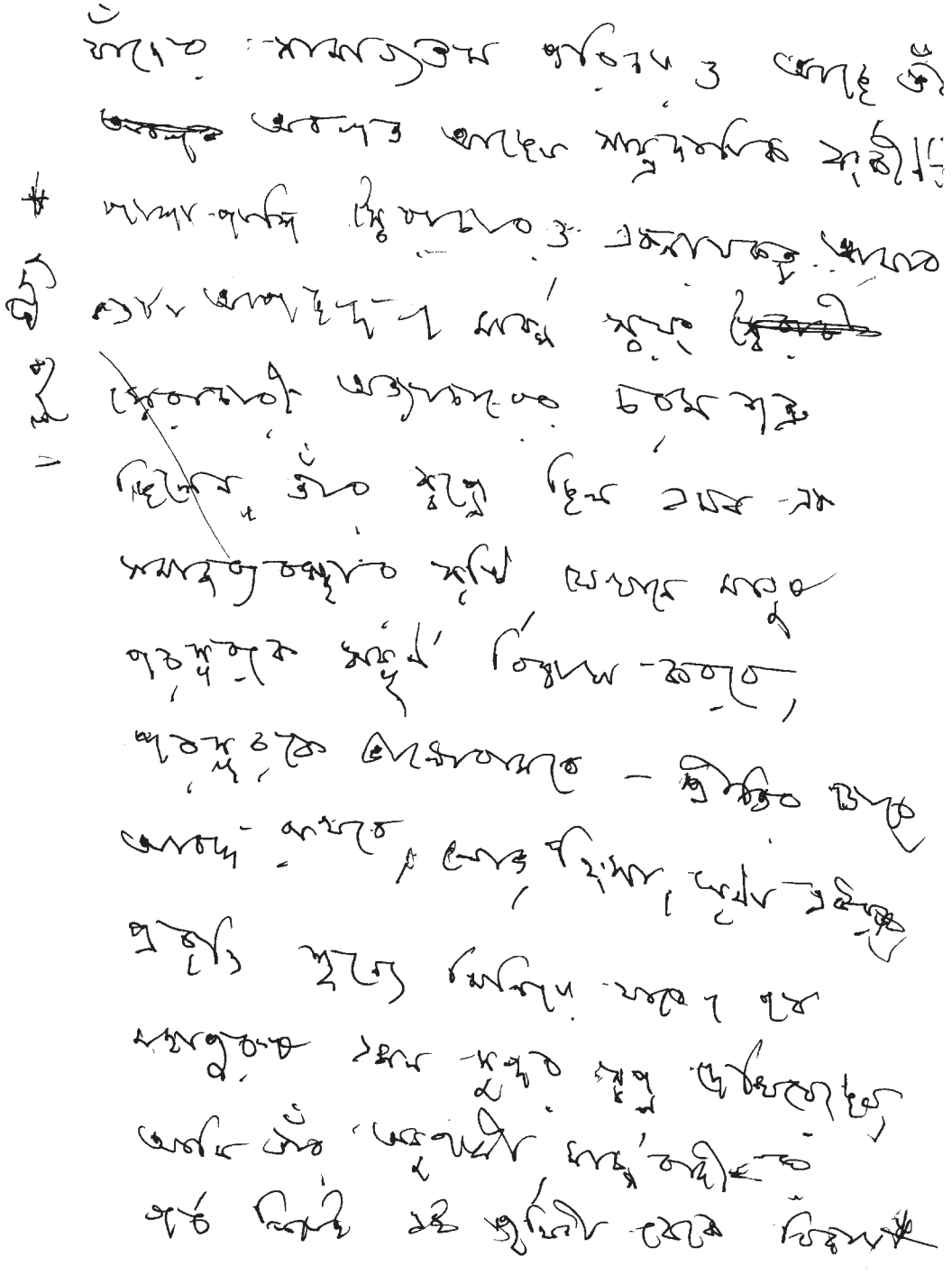

রাজনৈতিক বিশ্বাসে অবিচল বহুমুখী চিন্তক

সুজিত পোদ্দার

প্রথম বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হয় ১৯৭৭ সালের ২১ জুন। জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে আরো ৫ জন মন্ত্রী ওই দিন শপথ গ্রহণ করেন। অশোক মিত্র অর্থ, আবগারি, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা দপ্তরের মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অশোকবাবু রাসবিহারী কেন্দ্র থেকে সিপিআই(এম)-এর প্রতীকে জয়ী হলেও তিনি পার্টির সদস্য ছিলেন না তখন এবং পার্টির কাজকর্মের সঙ্গে খুবই সীমিত যোগাযোগ ছিল। তাই শপথ গ্রহণ করার পর পার্টির রাজ্য দপ্তরে এসে প্রমোদ দাশগুপ্তের সঙ্গে দেখা করে পার্টির কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত কোনো কমরেডকে অর্থমন্ত্রীর আপ্ত সহায়কের কাজ করার জন্য পাঠাতে বলেন। প্রথমে এক-দুজনের সঙ্গে কথা হলেও সমস্যার সমাধান হয়নি। শপথ গ্রহণের এক সপ্তাহ পর একদিন সকালে আমাকে পার্টির রাজ্য দপ্তরে ডেকে পাঠানো হয়। প্রমোদ দাশগুপ্ত আমাকে বললেন, অশোকবাবু আমাদের দলের মন্ত্রী তুমি ওর সঙ্গে কাজ করবে। আমি পার্টির নির্দেশে অবশ্যই রাজি হলাম। সেদিন সকালে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী এবং জ্যোতিবাবু রাজ্য দপ্তর থেকে এলিট সিনেমা হলে নিকোলাস অ্যান্ড আলেকজান্ড্রা (Nicholas and Alexandra) সিনেমা দেখতে গেলেন। সিনেমাটি রাশিয়ার সম্রাট জার নিকোলাস ২-এর জীবন ও ইতিহাস নিয়ে তৈরি। আমিও ওঁদের সঙ্গে গেলাম। সিনেমা দেখার পর বুদ্ধদা আমাকে রাইটার্স বিল্ডিংসয়ে অর্থমন্ত্রীর ঘরে নিয়ে অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে পাশে নিজের ঘরে চলে গেলেন। আমাকে দেখে অশোকবাবু বললেন, 'একেবারে ভালো মানুষের চেহারা'। এরপর অপছন্দ করেন কীভাবে? আমার পরিবারের খোঁজখবর নিলেন। বললাম অবিবাহিত, মা-বাবা, ভাই-বোন সবাই একসঙ্গে থাকি। তাহলে এই অল্প টাকায় চলবে কি না জিজ্ঞেস করলেন। বললাম, এখন চলছে আগামী দিনেও চলে যাবে।

তখনও মন্ত্রীর নিজস্ব অফিস অর্থ দপ্তরের দুই-একজন অফিসার এসে সাময়িকভাবে কাজ চালাচ্ছিলেন। একজন বয়স্ক ভদ্রলোককে ডেকে বললেন, 'ইনি সুজিত পোদ্দার, আমার আপ্ত সহায়ক হবেন। ওঁর সরকারি নিয়োগের ব্যবস্থা করুন আজই।' তারপর আমি জানতে চাইলাম, আমার কী কাজ। উনি অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, 'আমার নিজের কী কাজ তাই এখনও জানি না, আপনাকে কী বলব! কাজ করুন, জেনে যাবেন।'

সেই দিন থেকেই, অচেনা এই পার্টির দপ্তর থেকে পাঠানো ৩০ বছরের ছেলেকে, নিজের কাজের সঙ্গে যুক্ত করে নেন। ধীরে ধীরে বুঝতে পারি কিছু কাজকর্মে তিনি আমার ওপর নির্ভর করছেন। অশোক মিত্রের মতো পণ্ডিত ব্যক্তির সান্নিধ্যে এসে ওঁর আস্থা অর্জন করতে পেরে আমার কাজের ইচ্ছা আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিছুদিনের মধ্যেই আমি ওঁর স্ত্রী গৌরী মিত্র এবং ওঁর মা-এর সঙ্গেও পরিচিত হয়ে ওঁদের স্নেহভাজন হই। অশোক মিত্র ও গৌরী মিত্র অল্পদিনের মধ্যেই আমার পরিবারের সকলের সঙ্গেই পরিচিত হন।

কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারি, মন্ত্রী অশোক মিত্র আর ব্যক্তি অশোক মিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ। মন্ত্রীর দপ্তরে তিনি নিয়মের নিগড়ে বাঁধা মানুষ। দপ্তরের প্রধান সচিবের সঙ্গে দিনে বহুবার একান্তে নিজের ঘরে কথা বলেন, কখনো ডেকে আলোচনা করেন। কিন্তু দপ্তরের অন্যান্য অফিসারকে তিনি নিজে ডেকে আলোচনা করেছেন, কিন্তু ওঁরা কখনোই বিনা অনুমতিতে আসতে পারতেন না। এইরকম আঁটোসাঁটো নিয়মে অন্য কোনো মন্ত্রী কখনো দপ্তর চালিয়েছেন বলে জানা নেই। ফলে তিনি প্রশাসনের অভ্যন্তরে কিছু মহলে সমালোচিতও হতেন। ওঁদের ধারণা ছিল অশোকবাবু প্রধানত সরকারি চাকুরি বা শিক্ষকতা করেছেন; রাজনীতি সরাসরি করেননি। তাই কিছুটা ব্যতিক্রমী।

১৯৭২-এ কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টার পদ থেকে ইস্তফা দেন প্রধানত রাজনৈতিক মতপার্থক্যের জন্য। এর পর তিনি আর কোনো সরকারি চাকরি করার কথা ভাবেননি। কখনো কখনো অল্প সময়ের জন্য দেশে এবং বিদেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কিছু সময়ের জন্য অধ্যাপনার কাজ করেছেন। একইসঙ্গে সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হতে থাকেন। এবং সেই রাজনীতির সূত্র অবশ্যই কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)।

প্রধানত জ্যোতি বসু এবং স্নেহাংশু আচার্যের মাধ্যমে। ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা জারি হওয়ার পর তিনি কলকাতায় চলে এসে জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে মিছিলে পা মেলানো শুরু করেন। তখন যে পথ চলা শুরু হয়েছিল মৃত্যুর কিছুদিন আগে পর্যন্ত অর্থাৎ ২০১৮ সালের ১ এপ্রিল যখন ভীষণ অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার জন্য বার বার আমাকে ফোন করছেন আর একই সঙ্গে 'আরেক রকম'-এর শুভনীলের সঙ্গে পত্রিকার লেখা নিয়ে আলোচনা করছেন বা করার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন, তত দিন পর্যন্ত রাজনীতিই ছিল প্রথম এবং প্রধান চিন্তা।

অশোকবাবু একমাত্র মন্ত্রী যিনি প্রতিদিন সকাল সাড়ে আটটায় অফিসে আসতেন। একজন পিএ প্রতিদিন এই সময় কাজে হাজির থাকতেন। দিল্লিতে কোন বিষয়ে চিঠি পাঠাতে হবে, অফিস আসার আগেই ঠিক করে আসতেন। কোন বিষয়ে চিঠি লিখবেন, অথবা বিকেলে সাংবাদিক বৈঠকের জন্য প্রচারপত্র তৈরি করবেন অথবা কোনো আলোচনা সভায় ভাষণ কিংবা কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তনে ভাষণের বিষয়বস্তু কী হবে, তাও। এসেই ওই ডিকটেশন শুরু করে দিতেন। ঘণ্টা খানেক পর ওই চিঠি তৈরি হত অথবা খসড়া তৈরি করে রেখে দিতেন। একবার কখনো প্রয়োজনে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে চিঠি দিল্লিতে পাঠিয়ে দিতেন। অনেকসময় বিকেলে সাংবাদিকদেরও এর কপি দিয়ে দিতেন। শুধু অর্থ দপ্তর নয়, মুখ্যমন্ত্রীর জন্যও বিবিধ বিষয়ে চিঠি খসড়া তৈরি করে পাঠাতেন, বিশেষ কোনো বিষয়ে যখন প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজন হত।

১৯৭৭ সালের পর রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্র রাজ্য আর্থিক বিন্যাসের পর্যালোচনার বিষয়ে বিভিন্ন রাজ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পেরেছিল। অশোকবাবুর প্রধান যুক্তি ছিল, ভারতের রাষ্ট্রকাঠামো নামেই যুক্তরাষ্ট্রীয়, আর্থিক ক্ষমতার বিন্যাসে কেন্দ্রই সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছে। মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাজ্য সরকারেরই। রাজ্যের হাতে আরো আর্থিক ক্ষমতা না থাকলে গরিব মানুষের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতির কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব নয়। শুধু সরকারি মহলে নয়, শিক্ষক, গবেষক, প্রায় সব বিরোধী রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন শ্রমিক কর্মচারী সংগঠন, ছাত্র-যুব সংগঠন কেন্দ্র-রাজ্য ক্ষমতার পুনর্বিন্যাসের দাবিতে সোচ্চার হতে থাকে। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাসের দাবিতে কলকাতায় ১৯৭৮ সালে যে আলোচনাসভা আয়োজন করা হয় তাতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের প্রথম সারির সকল অর্থনীতিবিদ অংশগ্রহণ করেন। এর পর শ্রীনগরে এবং অন্যত্র এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের সমর্থনে কেন্দ্রীয় সরকার যখন ভ্যাট চালু করে তখন রাজ্যের আর্থিক ক্ষমতার নিজস্ব পরিধি আরো খর্ব করা হবে ভেবে অশোকবাবু খুবই বিচলিত বোধ করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, ভ্যাট আইন সংবিধানবিরোধী। অনেক আইনজীবীর সঙ্গেও আলোচনা করেন। ওঁরা ব্যক্তিগতভাবে ওঁর সঙ্গে সহমত পোষণ করেন, কিন্তু কোর্টে দাঁড়িয়ে এর বিরোধিতা করার সাহস দেখাননি।

অশোকবাবু মহাকরণে এসে সকাল সাড়ে আটটা থেকে সকাল সাড়ে দশটা পর্যন্ত চিঠি লেখা, ফাইল দেখা বা অন্য কোনো লেখা-পড়ার কাজ থাকলে শেষ করে সকাল ১০টার পর অপেক্ষা করতেন সকালের আড্ডার জন্য। তখন সত্যব্রত সেন এবং পরিমল মিত্র এসে হাজির হতেন। চায়ের সঙ্গে চলত রাজনৈতিক আলোচনা। অবশ্যই সরকার এবং পার্টির কাজকর্মের সমালোচনা। আমারও এই আড্ডায় উপস্থিত থাকার অনুমতি ছিল। মূল বক্তা অবশ্যই পরিমল মিত্র। এই আধ ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট অন্য কারো প্রবেশাধিকার ছিল না। এগারোটা থেকে আস্তে আস্তে আবার তিনি কাজে মন দিতেন। অশোকবাবুর কাজের ধারা এমন ছিল, তিনি কোনো ফাইল টেবিলে রেখে বাড়ি যেতেন না, কোনো চিঠির জবাব না দিয়ে দিনের কাজ শেষ করতেন না। তথাপি তিনি ৫টার পর খুব একটা অফিসে থাকতেন না। ওঁর খালি টেবিলে শুধু একটা বই সব সময় থাকত। সেটা ভারতীয় সংবিধানের পকেট এডিশন। সারা দিন কাজের ফাঁকে এই বইটির পাতা উলটাতেন। আমার মতে, ওঁর মতো সংবিধানবিশেষজ্ঞ খুবই কমই দেখা যাবে। আইনজীবী, বাচ্চু পাল, বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যদের সংবিধানের বিভিন্ন দিক নিয়ে ওঁর সঙ্গে আলোচনা করতে দেখেছি।

১৯৭৮ সালের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন, অপারেশন বর্গা, স্কুল শিক্ষাকে অবৈতনিক করা, সরকারি তহবিল থেকে শিক্ষকদের বেতন প্রদান, কেন্দ্র-রাজ্যের সমহারে মহার্ঘভাতা প্রদান, পঞ্চায়েত ও উন্নয়ন দপ্তরের সমন্বয়ে 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প', 'নিবিড় গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প', 'সামাজিক বনসৃজন' প্রভৃতি প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামের মানুষের আর্থিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। পঞ্চায়েতের অন্যতম সাফল্য, প্রথম পাঁচ বছরের মধ্যে গ্রামের মানুষের জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। শুখা মরশুমে খেতমজুর আর প্রান্তিক চাষি ভুখা থাকে না। মহাজনের সুদের খপ্পরে পরড়তে হয় না। ধান উৎপাদনে রাজ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়। ছোটোবেলায় পড়েছি বন্যার উপকারিতা ও অপকারিতা। ১৯৭৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় অতিবৃষ্টির ফলে ব্যাপক বন্যা হয়। সপ্তাহাধিক সময় জনজীবন স্তব্ধ হয়ে যায়। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচিত প্রায় ৬০ হাজার নির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রতিনিধি যারা প্রধানত খেতমজুর বা প্রান্তিক চাষি কিছু স্কুলশিক্ষকও, তারা বন্যাত্রাণে দিন-রাত পরিশ্রম করে

বন্যা-পরিস্থিতি মোকাবিলা করে ত্রাণের ব্যবস্থা করেন। পরবর্তী কালে এই পঞ্চায়েতই ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামের পুনর্গঠন প্রকল্পে অংশ নেয়। যাঁরা নির্বাচিত প্রতিনিধি তাঁরাই দিনের বেলায় শ্রমিকের কাজ করে বাড়ি, রাস্তা, স্কুল তৈরি করছেন, আবার রাতে হ্যারিকেন আলোতে বসে টাকা খরচের হিসেব তৈরি করছেন। বন্যাত্রাণ ও গ্রাম পুনর্গঠনের মাধ্যমে সরকারি আমলারা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত যুক্ত থেকে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের যে ভিত পশ্চিমবঙ্গে তৈরি করা হয় এর অনুকরণে সারা ভারতে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা তৈরি হতে থাকে।

সত্তরের দশকের শেষ ভাগে বা আশির দশকের শুরুতে যখন অশোকবাবু অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী ছিলেন তখন রাজ্যগুলিকে প্রতিনিয়ত আর্থিক সংকটের মধ্যে দিয়ে সরকার চালাতে হত। অর্থ কমিশন পাঁচ বছরের জন্য রাজস্ব ভাগের পরিমাণ নির্ধারণ করে দিত আর পরিকল্পনা কমিশন বাৎসরিক পরিকল্পনা বরাদ্দ এবং রাজ্যের আয়ের নিরিখে পরিকল্পনা খাতে রাজ্যের বাৎসরিক ব্যয়ের পরিমাণ ঠিক করে দিত। বাৎসরিক বাজার থেকে ঋণ নেওয়ার পরিমাণও নির্ধারণ করে দিত। এই সীমিত আয়ের মধ্যেই রাজ্যের কাজকর্ম চালাতে হত। এই রকম কেন্দ্র-রাজ্যের আর্থবন্টন ব্যবস্থার ফলে মাঝে মাঝে পরিস্থিতি জটিল হত। কারণ রাজ্য সরকারের ব্যয় প্রাত্যহিক কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার থেকে দেয় অর্থ আসত অনিয়মিতভাবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে ওভার ড্রাফট নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু সাত দিনের মধ্যে টাকা শোধ না করলে সরকারের চেক বাউন্স করার ভয় থাকত। এই চাপের মধ্যে বিরোধী দল পরিচালিত সরকার চালানো খুবই কঠিন কাজ ছিল।

আজকাল রাজ্য সরকারের বাজার থেকে ধার নেওয়ার অধিকার অবাধ। আশির দশকের শুরুতে বা সত্তরের দশকের শেষ ভাগে রাজ্য সরকার বাজার থেকে কী পরিমাণ ঋণ নিতে পারবে সেটা পরিকল্পনা কমিশনে নির্ধারিত হতো। টাকার পরিমাণ বছরে ৪০০-৫০০ কোটি টাকার বেশি হতো না, কিন্তু এখন আর রাজ্য সরকারের উপর কেন্দ্রর কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করা থাকে না। এখন প্রতি বছর রাজ্য সরকারের ধার নেওয়ার পরিমাণ ৪০ হাজার থেকে ৫০ হাজার কোটি টাকাও ছাড়িয়ে যায়।

অশোকবাবু মন্ত্রী হওয়ার পর জেলার পার্টির সঙ্গে খুবই সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়। পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা রূপায়ণ, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা দপ্তরের কাজের প্রয়োজনে জেলায় সংশ্লিষ্ট বিভাগের কাজের সঙ্গে যুক্ত অফিসারদের নিয়ে বৈঠক করতেন এবং সেইসঙ্গে জেলা পার্টির আয়োজিত সভা-সমিতিতেও যোগ দিতেন। পার্টির নেতা ও কর্মীদের ওঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার খুব আগ্রহ থাকত। অশোকবাবুর বর্ধমান, মেদিনীপুর, বীরভূম, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার প্রভৃতি জেলার নেতাদের সঙ্গে খুবই যোগাযোগ ছিল। অন্য জেলার নেতারাও পঞ্চায়েতের কাজে দেখা করতেন বা যোগাযোগ করতেন।

অশোকবাবু নির্দল প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হলেও অল্পদিনের মধ্যেই তিনি পার্টির সদস্য পদ গ্রহণ করেন এবং ১৯৮৫ সালের রাজ্য সম্মেলন থেকে রাজ্য কমিটির সদস্যও নির্বাচিত হন। ১৯৮২ সালের নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর অল্পদিন তিনি মন্ত্রী ছিলেন না। মন্ত্রী শংকর গুপ্তের মৃত্যুর পর যাদবপুর থেকে উপনির্বাচনে জয়ী হয়ে আবার অর্থ ও উন্নয়ন এবং পরিকল্পনা দপ্তরের মন্ত্রী হন।

১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে দু-বার স্বল্পমেয়াদি সরকার চালানোর অভিজ্ঞতা থেকে পার্টি সবসময় ১৯৭৭ সালের বামফ্রন্ট সরকারের স্থায়িত্ব সম্পর্কে খুব নিশ্চিত ছিল না। কিন্তু ১৯৮২ সালে দ্বিতীয় বার বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকার গঠনের পর থেকে পার্টি সরকারের স্থায়িত্ব সম্পর্কে কিছুটা নিশ্চিত হয়। কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারও সব রাজ্যে কংগ্রেস দলের সরকার থাকবে এই ভাবনা ত্যাগ করতে থাকে।

দ্বিতীয় বার মন্ত্রীসভায় আসার পর থেকে অশোকবাবু আর প্রথমবারের মতো কাজে ছন্দ ফিরে পাচ্ছিলেন না। এই মনোভাব তিনি কখনো আমার কাছে বা অন্য কারো কাছেই ব্যক্ত করেননি। কিন্তু দৈনন্দিন কাজে তেমন উৎসাহ পাচ্ছেন না এই কথা হয়তো কখনো আমাকে বলেছেন। কিন্তু তিনি মন্ত্রীসভা ছেড়ে চলে যাবেন এই অবস্থার কথা কখনো ভাবিনি। সেদিন ১৯৮৬ সালের জানুয়ারি মাসের ১৭ তারিখ। তিনি প্রতিদিনের মতো সকাল সকাল অফিসে আসেন। বিকেলে একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক সভায় ভাষণ দেওয়ার কথা। দুপুরে জ্যোতিবাবুর ঘরে দেখা করতে যান। হয়তো জ্যোতিবাবুই ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ কথা বলে ফিরে আসেন। কী কথা হয় তখন আমার জানা ছিল না। তিনি ওঁর ঘরে কাজ করছিলেন। বিকেলে সভায় ভাষণ দিয়ে ফিরে আসেন। কিছুক্ষণ পর আমাকে ঘরে ডেকে পাঠান। তিনি আমাকে জানালেন যে আজই তিনি মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করবেন এবং পার্টির সদস্যপদ ত্যাগ করবেন।

তিনি ঘরে বসে যখন এইসব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং নিজের হাতে তিনটি পদত্যাগ পত্র লিখেছেন, তখন আমি ঘরের বাইরেই ছিলাম। তিনি শুধু পদত্যাগ পত্র লেখেননি এই খবর ওঁর দুই বন্ধু 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার সম্পাদক অমলেন্দু দাশগুপ্তকে এবং 'বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক ইন্দ্র সেনকে ফোনে জানিয়ে আমাকে ওঁর ঘরে ডাকেন। আমাকে পদত্যাগের সিদ্ধান্তের কথা জানান এবং এই

সিদ্ধান্তে তিনি অবিচল থাকবেন, তাই তিনি ইতিমধ্যে ফোনে দুই সংবাদপত্রকে পদত্যাগের খবর জানিয়ে দিয়েছেন। আমার হাতে তিনটি বন্ধ খাম তুলে দিয়ে যথাস্থানে পৌঁছে দিতে বলে অফিস ত্যাগ করেন।

আমি তিনটি চিঠি নিয়ে প্রথমে জ্যোতিবাবুর কাছে যাই। তিনি শুনে কিছুক্ষণ চুপ থেকে আমাকে বললেন, 'এই চিঠি নিয়ে তুমি পার্টি অফিসে গিয়ে শৈলেনকে দাও।' শৈলেনদার কাছে প্রায় বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো অবস্থা। দুই-একজন সহকর্মীর সঙ্গে কথা বলে ঠিক করলেন আমাকে নিয়ে অশোকবাবুর সঙ্গে দেখা করতে যাবেন। এই সাক্ষাৎ সৌজন্যমূলকই হল। পরদিন সকালে পার্টি অফিসে আসতে বলে শৈলেনদা বাড়ি চলে গেলেন। আমিও সেদিনের মতো বাড়ি চলে যাই। বাড়িতে পরিবারের সবাইকে জানাই। কারণ পরদিন সকালে খবর বের হবে।

পরদিন সকালে পার্টি অফিসে যাই। সেখানে জ্যোতিবাবু সকলের সঙ্গে আলোচনা করে পদত্যাগ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেন। জ্যোতিবাবু আমাকে বললেন, অর্থ দপ্তর আমার হাতেই থাকবে। তুমি যেমন কাজ করতে সেই কাজ আমার সঙ্গে থেকে করবে। জ্যোতিবাবুর নির্দেশ মতো শৈলেনদা বিধানসভা থেকে পদত্যাগের চিঠি আমার হাতে দিয়ে দেন, বিধানসভায় স্পিকারের হাতে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে। বিধানসভায় হালিম সাহেব জানতেন কারণ খবরের কাগজে ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি চিঠি নিজের হাতে নিয়ে বললেন, তুমি এনেছ। তাহলে কী করবে? ঠিক আছে, আমি দেখছি। আমি বেরিয়ে যাই। অফিসে যাইনি কারণ সরকারি অফিসার সাংবাদিক সকলেই আমার সঙ্গে কথা বলতে আসবে। আমি অন্তত ওই দিন অফিস না যাওয়ারই সিদ্ধান্ত নিই। আমি অনেক ভেবে আলিপুরে অশোকবাবুর বাড়িতে যাওয়া ঠিক করলাম। গৌরী মিত্র আমাকে দেখে খুবই খুশি হলেন। আমার মনে হয়েছে ওনার মা এবং স্ত্রী হয়তো এই সিদ্ধান্তে খুব খুশি হতে পারেননি। সেইদিন থেকে আমার রাইটার্স, আলিমুদ্দিন স্ট্রিট ও আলিপুরের বাড়ি তিন জায়গাতেই আগের মতো যাতায়াত চলতে থাকে।

আমার মনে হয়েছে, তিনি কেন পদত্যাগ করেছেন সেটা মুখ্য বিষয় নয়। উনি হয়তো এই গতানুগতিক কাজ থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছেন। জ্যোতিবাবু এবং সমগ্র রাজ্য পার্টি, উনি মন্ত্রীসভা এবং পার্টি ছেড়ে চলে যাওয়ায় খুবই ব্যথিত। কিন্তু ওঁরা কেউই ওঁর প্রতি বিরূপ মনোভাব গ্রহণ করেননি। বেশ কয়েক মাস পর জ্যোতিবাবুর বাড়িতে গেছি, বাজেট নিয়ে আলোচনা হবে। অফিসাররা আসবেন। আমাকে একা পেয়ে জ্যোতিবাবু বললেন, দেখলে, আমার ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে অশোকবাবু চলে গেলেন।

সকলেই জানেন, অশোকবাবু বহুমুখী প্রতিভাধর মানুষ। কিন্তু আমি মনে করি, ওঁর প্রধান সত্তা উনি একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রই সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের মুক্তির পথ। ভারতবর্ষে প্রধান বাম দল মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি। ভুলত্রুটি সত্ত্বেও এই দলই বামপন্থী আন্দোলনের পুরোধা। এই দলকে সমর্থন এবং প্রয়োজনে সমালোচনা দুইই করতে হবে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই মতেই আস্থা রেখেছেন।

কর্মজীবনের বেশিরভাগ সময় অশোকবাবুকে দিল্লিতে উত্তর ভারতে বা দেশের বাইরে থাকতে হয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি হয় পঞ্চাশের দশকের গোড়া থেকেই। তৎকালীন নেতৃত্বের মধ্যে ওঁর কাছে বেশি শুনেছি, ভূপেশ গুপ্ত, মোহিত সেন, হীরেন মুখার্জি আরো অনেকের কথা। ১৯৫৭ সালে কেরালায় বাম মন্ত্রীসভা গঠিত হওয়ার পর নাম্বুদ্রিপাদের সঙ্গেও যোগাযোগ হয়। কেরালার অন্যান্য নেতৃত্বের সঙ্গেও পরিচয় হয়। কলকাতায় জ্যোতি বসু, প্রমোদ দাশগুপ্ত, স্নেহাংশু আচার্য, হরেকৃষ্ণ কোঙার আরো অনেকের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ তৈরি হয়।

কিছু কিছু ব্যাপারে রাজনৈতিক দলের বাধ্যবাধকতার সঙ্গে একমত হতে পারতেন না। যেমন, বামফ্রন্ট সরকারের শিল্পনীতি, জমি অধিগ্রহণ, বেসরকারি পুঁজির লগ্নি ইত্যাদি ব্যাপারে ওর মতানৈক্য ছিল। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও পার্টির নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ অটুট ছিল। সরকার থেকে চলে যাওয়ার পরও তিনি প্রশাসনিক সংস্থার কমিটির চেয়ারম্যান হন, শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান হন। ১৯৯৪ সালে রাজ্যসভায় নির্বাচিত হন। তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে কোনো রকম বোঝাপড়ার বিপক্ষে ছিলেন। কিন্তু ২০১৬ সালে অসমর্থ শরীরে বাম-সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থীকে প্রয়োজনে হামাগুড়ি দিয়েও ভোট দেওয়ার কথা বলেছিলেন।

ভারতবর্ষে বিভিন্ন কমিউনিস্ট দলভুক্ত বা সমর্থক মানুষ আছেন। এরা সকলেই পুঁজির শোষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের শরিক। তাই ওদের সকলকে নিয়ে চলার জন্য ২০১৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকে 'আরেক রকম' নামে পাক্ষিক পত্রিকার সূচনা করেন। এই পত্রিকায় শুধু প্রবন্ধ ছাপা হয়। অবশ্যই বামপন্থায় বিশ্বাসী মানুষই এর সঙ্গে যুক্ত।

পরিশেষে একটা কথা বলতে চাই। অশোকবাবুর মৃত্যুর পর একটা কথা ওঁর উক্তি বলে প্রচারিত হচ্ছে— আমি ভদ্রলোক নই আমি কমিউনিস্ট। এই কথা বা এর পরিবর্তিত বা অপরিবর্তিত বয়ানের উৎস মন্ত্রী অশোক মিত্রের ঘরে আলোচনা। যেখানে শুধু দুজন মানুষ ছিলেন। মন্ত্রী স্বয়ং এবং একজন আমলা। আলোচনা শেষে মন্ত্রী কোনো সাংবাদিককে

এই ব্যাপারে কোনো কথা বলেননি। অশোকবাবু এই ব্যাপারে খুবই ব্যথিত ছিলেন কারণ তিনি নিজেকে ভদ্রলোক বলবেন না এটা ওঁর কাছে চিন্তার অতীত। অবশ্যই তিনি কমিউনিস্ট বলে গর্বিত ছিলেন। এই ব্যাপারে কোনো বিতর্কে জড়াতে ওঁর রুচিতে বাধে বলে কোনো প্রতিবাদ জানাননি।

তিনি আদর্শবাদী মানুষ ছিলেন বলেই ১৯৭২ সালে মাত্র ৪৩ বছর বয়সে কেন্দ্রীয় সরকারের সচিব পদমর্যাদার চাকরি ছেড়ে রাজনৈতিক মিছিলে চলা শুরু করেন। বাকি জীবন এই পথেই চলেছেন। কখনো জানার প্রয়োজন বা সুযোগ হয়নি, আর্থিক সুবিধা বা অসুবিধার কথা। একবার Prostate-এ Cancer অপারেশনের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হন। তখন স্ত্রী গত হয়েছেন। ওঁর ধারণা ছিল হয়তো আর বাঁচবেন না। কিন্তু অপারেশনের পর তিনি হাসপাতালেই সুস্থ হতে থাকেন। বিকেলে হাসপাতালে দেখলাম সবাই চিন্তিত, অশোকবাবু উত্তেজিত, অসংলগ্ন কথা বলছেন। আমি ভেতরে গিয়ে বললাম, 'আপনি এত উত্তেজিত কেন।' আমাকে বললেন, 'আপনি বুঝতে পারছেন না, আমি বাড়ি গেলে খাব কী? আমি আর লিখতে পারব না।' আমি অভয় দিলাম, 'চলুন বাড়ি, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

তখন ছিল ২০০৯ সাল। তিনি সুস্থই ছিলেন এবং নিয়মিত বিভিন্ন কাগজে লিখতে থাকেন। বিগত দুই বছর ওঁর শারীরিক দুর্বলতা ক্রমশ বাড়তে থাকে। ছোটো বোন বিদেশে থেকে এসে মাঝে মাঝে দেখাশুনো করতে থাকেন। কিন্তু গত বছর শারীরিক দুর্বলতা এই অবস্থায় পৌঁছোয় যখন ওঁর বোন শ্রীলতা ঘোষ কলকাতায় কিন্তু তাঁর ফিরে যাওয়ার সময় হয়েছে। অশোকবাবুর সাক্ষাতে আমাদের কয়েক জনকে ডেকে বললেন, 'আমরা এখন চলে যাব কিন্তু মেজদার পক্ষে একা থাকা ঠিক নয়। দু-বেলা এটেনডেন্ট থাকলে ভালো হয়।' অশোকবাবু অনড়, কিছুতেই নার্স বা এটেনডেন্ট রাখবেন না। আমরা খুবই চিন্তিত হলাম, কারণ এর পরিণতি খুবই খারাপ হতে পারে। সকলে মিলে আরও কয়েকবার অনুরোধ করার পর তিনি বললেন, আমার এটেনডেন্ট রাখার মতো আর্থিক সঙ্গতি নেই। এরপর আমরা চুপ হয়ে যাই। এর পর তিনি যে কয়মাস বেঁচে ছিলেন ওঁর দিনের সঙ্গী বহু পুরনো বাড়ির কাজের সঙ্গে যুক্ত রবি এবং রান্নার আয়ার উপর নির্ভর ক'রে। আমরা নিরুপায় হয়ে আলোচনায় ভঙ্গ দিলাম।

শুধু আমি নই, আমার পরিবারের প্রতিটি মানুষ এবং আমার ভাই-বোন এবং ওদের পরিবারের সকলেই ওঁর এবং গৌরী মিত্রের স্নেহের পাত্র ছিল। ১ মে অশোকবাবু প্রয়াত হন। ২ তারিখ সকালে আমার পুত্র এসে আমায় বলল, 'বাবা আর সকালে তোমার মোবাইল বাজলে AM লেখা দেখা যাবে না।' শুধু সকালের ফোনে যোগাযোগই নয়, বিগত ৪০ বছরে ওঁর মতো পণ্ডিত মানুষের সান্নিধ্য, বিভিন্ন বিষয়ে ওঁর সঙ্গে কথা-বার্তার মাধ্যমে নিজেকে শিক্ষিত করার যে সুযোগ পেয়েছিলাম ১মে ২০১৮ থেকে হারিয়ে গেল সেই সুযোগ।

অসম্ভব দৈহিক কষ্টের মধ্যে তিনি বেশ কিছুদিন বেঁচে ছিলেন। তিনি কষ্ট থেকে মুক্তি পেয়েছেন। কিন্তু আমরা যারা ওঁর কাছে থাকার সুযোগ পেয়েছি, আমাদের বিয়োগব্যথা চিরকাল থাকবে। এ বামপন্থী রাজনীতির এক অপূরণীয় ক্ষতি।

অক্ষয়বটের দেশ

একজন মার্কসবাদী চিন্তকের ব্যক্তিবিশ্ব

কালীকৃষ্ণ গুহ

'তাঁর মতো একজন প্রজ্ঞাবান মানুষের বিদায় গ্রহণে যে শূন্যতা তৈরি হল তা আমাদের নিঃশব্দে বহন করতে হবে।' এই বাক্যটি অশোক মিত্রের স্মরণসভার বিজ্ঞপ্তিপত্রে বলা হয়েছে। কথাটি যে কোনোভাবেই অত্যুক্তি নয় তা যাঁরা তাঁর শূন্যতা বহন করে চলেছেন তাঁরা জানেন। মনে হতে পারে, তিনি তো কোনো দলের বা সমাজের কোনো অংশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন না, তাহলে এতখানি শূন্যতা কীভাবে তৈরি হল। এর উত্তরে বলতে হবে, একজন চিন্তাবিদ হিসেবে, সমাজতাত্ত্বিক হিসেবে, অর্থনীতিবিদ হিসেবে এবং, সর্বোপরি, একজন নৈতিক মানুষ হিসেবে তিনি একটা বিরাট স্থান অধিকার করে ছিলেন। এই স্থানটিও ক্ষমতার স্থান। মিশেল ফুকো আমাদের শিখিয়েছেন যে ক্ষমতা শুধু রাষ্ট্রশক্তির হাতে থাকে না, রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে যে দাঁড়ায় তারও থাকে। এমনকী একজন নিঃসঙ্গ ব্যক্তিমানুষেরও থাকে যদি তাঁর চিন্তার মৌলিকতা থাকে বা শুধু একটা নৈতিক অবস্থানের স্পর্ধিত উচ্চারণ থাকে। চিন্তাশক্তি আর নৈতিকতার শক্তি মানুষকে যে ক্ষমতাবান করে তা নতুন কিছু কথা নয়। তবু প্রসঙ্গত আরো একবার বলা। অশোক মিত্র ছিলেন অনেকদিন ঘরবন্দি, শ্রবণশক্তি আর দৃষ্টিশক্তি যাঁর প্রায় নিঃশেষিত হয়ে এসেছিল, তবু তিনি ছিলেন একজন বিরাট শক্তিমান ব্যক্তিমানুষ। তাই এই শূন্যতা, যা বহন করে যেতে হবে তাঁর বিপুল পরিবারের সদস্যদের যাঁরা তাঁর চিন্তার দ্বারা— অনৈতিক শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সামর্থ্যের দ্বারা অনেকখানি চালিত হয়েছেন, নৈতিকতার পথে চলার নির্ভরতা পেয়েছেন। অত্যাচারী শাসক বা সমাজবিরোধী-পরিচালিত একটা সমাজ যে পুরোপুরি ডুবে যায় না, তা এইরকম সব চিন্তক এবং নৈতিক ব্যক্তিমানুষের অবস্থানের জন্য। সৌভাগ্যবশত আমাদের আজকের এই অধঃপতিত সমাজেও এইরকম 'ক্ষমতাহীন' ব্যক্তিমানুষ আছেন, যাঁদের নৈতিক শক্তিই মানুষকে উঠে দাঁড়াবার শক্তি দেয়। আমাদের সমাজে সেই শক্তির অন্যতম ধারক ছিলেন অশোক মিত্র।

২

অশোক মিত্রকে প্রথমে কাছ থেকে চিনেছিলাম কবি অরুণকুমার সরকারের মৃত্যুর পর। অরুণকুমারকে নিয়ে যে স্মরণসভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতা ইনফরমেশন সেন্টারের দোতলায়, তা তৎকালীন অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্রের ব্যবস্থাপনায় ঘটেছিল। আহ্বানপত্রটিও তিনি ছাপানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আহ্বায়ক হিসেবে ছিলেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নরেশ গুহ এবং নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, তাঁরই প্রস্তাবমতো। বর্তমান লেখকের কাজ ছিল— অরুণকুমারের অনুজ, কবি আলোক সরকারের প্রবর্তনায়, (যনি ছিলেন আমাদের তরুণ বয়সের একজন পথপ্রদর্শকের ভূমিকায়) যোগাযোগগুলি ঘটিয়ে তোলা। তিনি অরুণকুমার সরকারের অভিন্নহৃদয় বন্ধু ও অনুরাগী— রাজনৈতিক দর্শনের ভিন্নতা বা বৈপরীত্য সত্ত্বেও। তিনি ছিলেন কবিতাপ্রাণ মানুষ। তাঁর মেধার বিচ্ছুরণ ছিল বিদুচ্চমকের মতো, পাঠবিস্তৃতি ছিল বিপুল। কেউ কেউ ভাবতে পারেন রাজনীতি তাঁর জায়গা ছিল না, তাঁর জায়গা ছিল রবীন্দ্রনাথ-জীবনানন্দ-বিষ্ণু দে-বুদ্ধদেব বসু-ধূর্জটিপ্রসাদ-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-সঞ্জয় ভটাচার্য-সমর সেন-অরুণকুমার সরকারদের পৃথিবীতে, অর্থাৎ সাহিত্যের নিষ্কলুষ আঙিনায়। বিশ্বচেতনার আঙিনায়— আন্তিত্বিক চিন্তাস্রোতে। ফলে, এই ভাবনা অযৌক্তিক নয়। তবে প্রত্যেক চিন্তকেরই থাকে সেই জীবনদৃষ্টি যা সমাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষতায় জড়িত রাখে তাঁকে। ফলে তিনি কোনো-একভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী হিসেবে অশোক মিত্র সমাজ-বিবর্তনের ব্যাপারে উদাসীন থাকতে পারেননি। তিনি শেষপর্যন্ত রাজনীতিতে আপাদমস্তক জড়িত হয়ে পড়েছিলেন— যখন দলে ছিলেন তখনও যেমন, যখন দল আর মন্ত্রীত্ব ছেড়ে এসেছেন তখনও সেইরকম। কিন্তু সাহিত্য ও সংগীতের প্রতি আকর্ষণ কমেনি তাঁর। সংগীত বলতে রবীন্দ্রসংগীত। তিনি এই ইচ্ছাও প্রকাশ করে গেছেন যে তাঁর মৃত্যুর পর যদি কোনো স্মরণসভার আয়োজন হয় সেখানে যেন

শুধু তাঁর প্রিয় রবীন্দ্রগানগুলিই গাওয়া হয়— যেন সেখানে স্মৃতিচারণের সূত্রে তাঁকে কোনোভাবে প্রশংসা না-করা হয়। তিনি ছিলেন একই সঙ্গে বিনয়ী, পরোপকারী, বন্ধুত্বের প্রশ্নে আকুল এবং সর্বতোভাবে নীতিনিষ্ঠ এবং, বলা যায়, সেইসূত্রে একজন কঠোর মানুষ।

কিন্তু, আশ্চর্য এই, তিনি নিজে কত যে স্মৃতিচারণ করে পুরোনো কিছু সময়খণ্ডকে আমাদের চিনিয়ে দিয়েছেন! অরুণকুমার সরকারের মৃত্যুর পর একটি নিবন্ধে তিনি লেখেন, 'অরুণকুমার সরকার কবি হিশেবে খ্যাতি কুড়িয়েছিলেন খানিকটা, কিন্তু বাইরের পৃথিবীর কাছে তাঁর যে-পোশাকি পরিচয়, তা, আমার কাছে অন্তত, উপহাস্য। মানবো না কোনো স্পর্ধিত উক্তি করছি, মানবো না নিছক ব্যকরণসম্মত বন্ধু-তর্পণ করছি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যে-পঁয়তিরিশ বছর গড়িয়ে গেছে, স্বভাব-প্রতিভায় অরুণকুমার সরকারের কাছাকাছি আসতে পারেন এমন ক'জন কবি আছেন? হাজার হাজার যশোপ্রার্থী, এই সাড়ে তিন-চার দশকের আয়তন অধিকার ক'রে, কবিতা রচনা করে গেছেন। কিন্তু যাঁরা কবিতা লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে কবি ক'জন? এক-আধ কুড়ি, এঁদেরই মধ্যে যশস্বী হয়েছেন; কিন্তু আবেগ, বোধ ও শৈলীর সংহতি যদি কষ্টিপাথর হয়, তাহলে অরুণকুমার সরকারের কাছাকছি ক'জন?' (*হলদে প্রজাপতি/ অচেনাকে চিনে চিনে*)। সাহিত্যবোধ আর বন্ধুত্ব পরস্পরকে প্রভাবিত ক'রে এই মন্তব্যটিকে জন্ম দিয়েছে সন্দেহ নেই। সন্দেহ নেই, এই মন্তব্যের মধ্যে এই সত্যটি উচ্চারিত হয়েছে যে 'আবেগ, বোধ ও শৈলীর সংহতি' না-থাকলে শুদ্ধতম কবিতা রচিত হতে পারে না, যার কিছু অরুণকুমারের হাতে রচিত হয়েছিল। ফলে এই মন্তব্যটি কিছু 'স্পর্ধিত' হয়েও সত্যবদ্ধ থেকে গেছে।

জীবনানন্দের মৃত্যুর পর, ১৯৫৫ সালে, তিনি লেখেন, 'কৈশোরের সিঁড়িতে সদ্য-পা-দেয়া আমরা, জীবনানন্দের কাব্যে এক বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য আবিষ্কার করে উল্লসিত, চকিত, অভিভূত হয়ে গেলাম। সে-এক অদ্ভুত মমতা-মাখানো অধিকারবোধ, আজ পর্যন্ত তা অব্যাহত; সে-সাম্রাজ্য আমরাই প্রথম আবিষ্কার করেছিলাম, সে-সাম্রাজ্য সুতরাং আমাদের। শোকের এই নিদারুণ মুহূর্তে দাঁড়িয়েও এখনো সেই গর্ব।' (বিবেকের কাছে/অচেনাকে চিনে চিনে)। মহৎ এই অধিকারবোধ, এই অধিকারবোধে একজন মহৎ কবিকে জীবনের মধ্যে পাওয়া।

প্রায় পঁচাশি বছর বয়সে এসে তিনি *আরেক রকম* পাক্ষিক পত্রিকার পরিকল্পনা করেন। ভাবলে অবাক হতে হয়, যেহেতু এই সেই বয়স যখন বিশ্বসংসারকে মনে মনে বিদায় জানিয়ে নীরব স্মৃতি রোমন্থনের কাজে আত্মনিয়োজিত থাকে মানুষ। ভাবলে আরো অবাক লাগবে যে জীবনের শেষ পাঁচ বছর, আমৃত্যু, তিনি লিখে গেছেন, স্মৃতিবিস্মৃতি এবং স্মৃতিবিস্মৃতির চেয়ে বেশি কিছু। সমাজের পতন আর অসাম্য তাঁকে কীরকম পীড়িত করত তা অনেকেই সামনে বসে দেখেছেন। এই পত্রিকা প্রকাশের কাজে প্রথম বছর তিনি শঙ্খ ঘোষের সাহায্য পেয়েছিলেন যখন শঙ্খ ঘোষ নিজে অশীতিপর! আশ্চর্য এই সম্মিলন!

৩

বর্তমান লেখকের কাছে ২০১৪ সালের শুরুতে প্রস্তাব আসে এই পত্রিকাটি সম্পাদনার দায়িত্ব নেবার। অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পর এই দায়িত্ব নিতেই হয়, যেহেতু অশোক মিত্রের প্রস্তাবে অসম্মত হবার সাহস সঞ্চার করা যায়নি। পত্রিকার দায়িত্ব দেবার পর অশোক মিত্র বর্তমান লেখককে প্রতি সংখ্যায় কিছু-না-কিছু লিখতে বলেন। এও ছিল একটা নির্দেশ। কিন্তু একজন অলস ও অন্যমনস্ক মানুষের পক্ষে এই কাজ হাতে নেয়া ছিল সত্যিই কঠিন। তবু নিতে হল। দু-বছর ধরে লিখে যেতে হল 'আসা-যাওয়ার পথের ধারে' শিরোনামে একটি কলাম। তুচ্ছাতিতুচ্ছ জ্ঞান ও স্মৃতির খড়কুটো নিয়ে, সাহিত্যপাঠের যৎসামান্য অভিজ্ঞতা আর আবেগ নিয়ে এই স্তম্ভটি দু-বছর ধরে কোনোক্রমে পূরণ করে মনে হল সবটুকু দেয়া হয়ে গেছে। আর নয়। তা ছাড়া এই সম্পাদনার দায়িত্ব, বলা যায় দুশ্চিন্তা, বহন করে যাওয়া অসম্ভব মনে হল। (তবে, স্বীকার করতে হবে, প্রণব বিশ্বাস সম্পাদকমণ্ডলীতে যোগ দেবার পর বর্তমান লেখকের ভার অনেকাংশে লাঘব হয়। আর অনেক গুণীজনের লেখা তাঁর মাধ্যমে হাতে আসে।) তা ছাড়াও আরো একটি নৈতিক বাধা ক্রমশ বড়ো হয়ে উঠল। বর্তমান লেখক মার্কসীয় দর্শন থেকে বস্তুবাদের শিক্ষা নিলেও— যা প্রকৃত অর্থে নাস্তিকতা এবং বিজ্ঞানমনস্ক জীবনদৃষ্টির শিক্ষা— সর্বতোভাবে নিজেকে মার্কসবাদী মনে করেন না। মার্কসকে একজন অতি শ্রদ্ধেয় দার্শনিক ভাবলেও সর্বতোভাবে নির্ভুল বলে মনে করেন না; চান এমন সাম্যভিত্তিকসমাজ যেখানে কোনো ভয় থাকবে না— অনাহারের ভয়, অচিকিৎসায়ভয়, অশিক্ষার ভয়, হিংসা দ্বেষ নিষ্ঠুরতার ভয়, চিন্তাপ্রকাশের বাধার ভয়— যেখানে সাম্য কোনো যান্ত্রিক নিয়মের মধ্য দিয়ে আসবে না, আসবে মেধা বা সৃষ্টিশীলতার প্রাকৃতিক বৈষম্য মেনেই। সেক্ষেত্রে অশোক মিত্র ঘোষিতভাবে মার্কসবাদী যাঁর কাছে মার্কসীয় দর্শন অব্যর্থ ও নিষ্কলুষ। কমিউনিস্ট সমাজগুলির একদলীয় শাসন, একনায়কতান্ত্রিক স্বৈরাচার, ব্যক্তিস্বাধীনতাহীনতা, যাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় তিনি তাঁদেরই একজন। তাঁদের চোখে সাম্যের চেহারা সমস্ত স্বৈরাচার ও ব্যক্তিপূজাকে অতিক্রম করে যায়। ফলে বর্তমান লেখকের মনে হল এই সম্পাদনার কাজ থেকে মুক্তি নিতে হবে, যদিও তাঁর চেষ্টা ছিল যুক্তিবাদ তথা বস্তুবাদ

ও বিজ্ঞানসচেতনাকে পত্রিকাটির মধ্য দিয়ে প্রসারিত করা আর সারা দেশ ও বিশ্বজুড়ে ঘটতে থাকা অন্যায়ের প্রতিবাদ মুদ্রিত করে যাওয়া। (বলা বাহুল্য, এব্যাপারে অশোকবাবুর খুবই উৎসাহ ছিল)। অশোকবাবুর কাছে সব কথা খুলে বলতে হল— শরীর-মনের অক্ষমতার কথা, দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতার কথা। তিনি সম্মতি দিলেন। বর্তমান লেখকের কাজ শেষ হল, যদিও সম্পাদকমণ্ডলীতে যুক্ত থাকতে হল, যেমন এখনও আছেন। এই কথাগুলি লেখার জন্য মার্জনাপ্রার্থনাসহ জানানো যায় যে বর্তমান লেখকের চিঠির উত্তরে অশোক মিত্র কাঁপা হাতে যে চিঠিটি লিখেছিলেন— যখন ক্ষীণদৃষ্টির কারণে তাঁর লাইন বেঁকে যেত— তা বর্তমান লেখকের কাছে একটি অনন্য প্রাপ্তি। তিনি লিখেছিলেন, 'আমার রচনাদির সঙ্গে যাঁদের সামান্যতম পরিচয়ও আছে তাঁরা অবগত আছেন যে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার পাশাপাশি স্বৈরাচার ও একনায়কত্ব আমার কতটা অপছন্দ। মার্ক্স স্বয়ং স্বৈরাচারী অত্যাচারের চরম শত্রু ছিলেন, তাঁর স্বপ্নে ছিল এমন এক সমাজব্যবস্থার সৃষ্টি যেখানে মানুষ পরস্পরকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করবে, পরস্পরকে ভালোবাসবে— প্রীতির ডাকে আবদ্ধ রাখবে, লোভ, হিংসা, ঘৃণা এইসব প্রবৃত্তি শূন্যে মিলিয়ে যাবে। যে মহাপুরুষ এমন সুন্দর স্বপ্ন দেখেছিয়েছেন, আমি তাঁর অনুষঙ্গী মার্ক্সবাদীর গর্ব নিয়েই এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে চাই।' বোঝা যায়, তাঁর মার্কসবাদের ধারণার স্বরূপ কী।

৪

অ্যারিস্টটল বলেছিলেন, 'আমরা যতদূর সম্ভব অমর হব।' তাই হয়েছিলেন অশোক মিত্র। নবতিপর জীবনে পৌঁছে তিনি আর বাঁচতে চাইতেন না। সদর্থেই তিনি যেন মৃত্যু বরণ করে নিয়েছেন। শুনেছি, শেষ পনেরো-কুড়ি দিন, তিনি জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও চোখ খোলেননি, আহার গ্রহণ করেননি, কথা বলেননি। যেন তিনি মৃত্যুর কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন কোনো পৌরাণিক চরিত্রের মতো! এখন আমাদের কাজ নিঃশব্দে তাঁর শূন্যতা বহন করা।

তাঁর নব্বই বছরে পা-দেয়া উপলক্ষে একটি কবিতা— হয়তো একে পদ্য বলাই ঠিক— লিখেছিলাম। কেউ একজন লেখাটি তাঁকে পড়ে শুনিয়েছিলাম বলে জানি। তিনি অবশ্য প্রত্যাশিতভাবেই কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেননি। আজ ভাবি তিনি লেখাটি শুনতে পেয়েছিলেন কি? নাকি শুনতে চাননি? আজ মনে হয় লেখাটি শুনতেই চাননি তিনি। পাঠকের মার্জনা চেয়ে লেখাটি এখানে রাখলাম:

অশোক মিত্র শ্রদ্ধাষ্পদেষু

নব্বইয়ে পা—
দিনগুলি হোক পার

দশটা বছর ফাঁকা
সামনে আছে রাখা

পিছনে কত স্মৃতি
সামনে তরুবীথি

সামনে ঝড়বাদল
কত-যে বৃক্ষতল

সকালবেলার আলো
সব থেকে আজ ভালো

রাতের তারা সব
অনন্তে নীরব

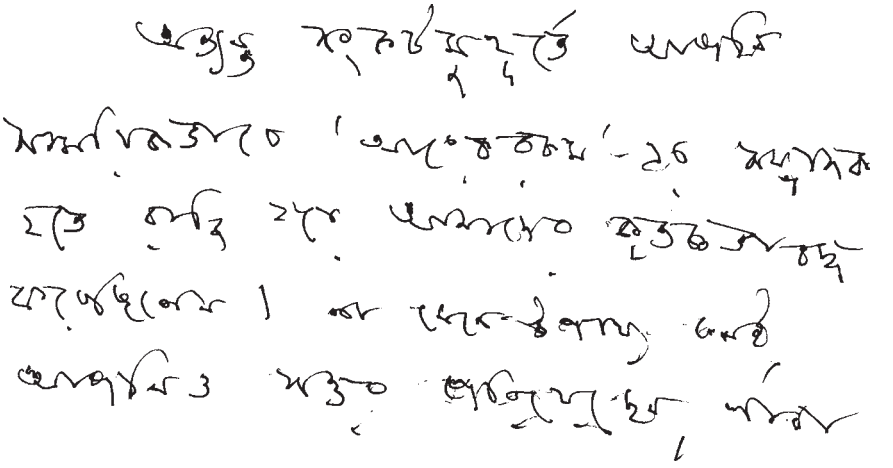

পুনঃপাঠ

একটি কাহিনি, একটি প্রস্তাব

অশোক মিত্র

বিগত কয়েক বছর ধরে আমাদের রাজ্যে চিটফান্ড কেলেঙ্কারির মাধ্যমে অসাধু ব্যবসায়ীরা হাজারো গরিব মানুষকে নিঃস্ব করেছে, বর্তমান শাসক দলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতে।

অশোক মিত্র রাজ্যের অর্থমন্ত্রী থাকার সময় এই ভুঁইফোড় সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে যে দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, তা আজকে মনে রাখা জরুরি। রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলেই যে গরিব মানুষের পক্ষে থেকে অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যায়, তার নিদর্শন রেখেছিলেন অশোক মিত্র। এবারের পুনঃপাঠ এ বিষয়েই।

সমস্যাটি পুরনো, অথচ ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে সাধারণ মানুষ কেমন যেন পরাঙ্মুখ। অবশ্য বলা হবে যে, মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তের শ্রেণিভুক্ত যাঁরা, তাঁরা লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধির শিকার, কাজ পাচ্ছে না বহু পরিবারের ছেলেমেয়েরা, সংসার চালানো প্রায় সাধ্যের বাইরে, এই অবস্থায় অনেককেই লোভের শিকার হতে হয়; 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু' কথাটা, ধরেই নেওয়া হয়, নিছক কথার কথা। পশ্চিমবঙ্গে একটি বিশেষ 'চিট ফাণ্ড'-এর কীর্তিকলাপ এখন সেই আস্তিক মানুষগুলোকে হতভম্ব করে তুলেছে।

ঠিক তেত্রিশ বছর আগে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার এমন একটি অসাধু প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবার পর এই ধরনের ব্যবসাগুলি কিছু দিনের জন্য গা-ঢাকা দিয়েছিল। কিন্তু গত কয়েক বছরের প্রশাসনিক শৈথিল্য কিংবা আরও গুরুতর কোনও প্রশাসনিক বিচ্যুতি, সেই পুরনো লোকঠকানোর ধান্দাবাজিকে ফিরে আসতে দিয়েছে, কিছু কুচক্রী বিবেকহীন অসাধু ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করেছে অবাধ সাম্রাজ্যবিস্তারে। তিন দশক আগে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার জনগণকে আপ্রাণ বোঝাতে চেষ্টা করেছিল যে, দেশে এমন কোনও শিল্প বা ব্যবসা থাকতে পারে না, যাতে বিনিয়োগ করে ষাট সত্তর আশি একশো শতাংশ মুনাফা হতে পারে। সঞ্চয়িতা নামক প্রতিষ্ঠানটি যখন লোককে ধোঁকা দিয়ে পয়সা লুটতে শুরু করে, তখন থেকে সরকার তৎপর হয়ে ওঠে। বেশ কয়েক সপ্তাহ কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে জনগণের কাছে আবেদন জানানো হয়: জেনেশুনে বিষ পান করবেন না। সরকারি টেলিভিশনেও সেই সতর্কবাণী দিনের পর দিন প্রচারিত হয়। কিন্তু তাতেও কোনও ফল না মেলায় প্রতিষ্ঠানটির সাহস আরও বেড়ে যায়। এই অবস্থায় বামফ্রন্ট মনস্থির করে: সতর্ক করা সত্ত্বেও যাঁরা এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছেন বা এর সঙ্গে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন, তাঁদের কিছু ক্ষতি হবে, কিন্তু সমাজের সার্বিক স্বার্থের কথা ভেবে এই প্রতিষ্ঠানটিকে উৎখাত না করে উপায় নেই।

এখানেই সমস্যা দেখা দিল। এ ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উপরে কর্তালি করার একচ্ছত্র অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের, রাজ্যগুলির কোনও এক্তিয়ার নেই। তা ছাড়া গত সত্তর-আশি বছর ধরে দক্ষিণ ভারতের প্রায় সর্বত্র বহু চিটফাণ্ড সৎভাবে কাজ করে যাচ্ছিল, সেটাও বিবেচনার মধ্যে রাখতে হত। দক্ষিণের রাজ্যগুলির প্রত্যন্ত অঞ্চলে, যেখানে ব্যাঙ্কের শখা তো নেই-ই, এমনকী ডাকঘরও অনেক দূরে, সে সব জায়গায় নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত কৃষিজীবী-শ্রমজীবী-গৃহবধূ-বিধবা-ছোট-ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ভুক্তদের প্রতি মাসে একটু-আধটু সঞ্চয়ের উপযোগিতা সম্পর্কে সজাগ করার জন্য এইসব প্রতিষ্ঠান কাজ করছিল। যাঁরা বিনিয়োগ করছিলেন, তাঁরা স্বাভাবিক হারেই সুদ পাচ্ছিলেন, যার মাত্রা কখনও শতকরা দশ ভাগ ছাড়িয়ে যায়নি। সুতরাং একমাত্র পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় সরকার দেশ জুড়ে এই ধরনের ফান্ডগুলিকে নিষিদ্ধ করবে সেটা প্রত্যাশিত ছিল না। এই রাজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থার দরকার ছিল। বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে যত বার যত ভাবে আবেদন পেশ করা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার এড়িয়ে গেছে। অথচ এই লোকঠকানো সংস্থাগুলিকে সংস্থাগুলিকে না ঠেকালেই নয়। অতএব বাধ্য

হয়ে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার কিছু কিছু বিকল্পের প্রস্তাব বহু বার দিয়েছিল এইসব ফাণ্ডকে আইনি নিগড়ে বাঁধার জন্য। কিন্তু কেন্দ্র এ সব ক্ষেত্রে নিজের একচ্ছত্র অধিকার এতটুকু ক্ষুণ্ণ হতে দিতে রাজি ছিল না। বার বার সংশোধন আইনের খসড়া করে পাঠানো হয়েছে, তাগাদা দেওয়া হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে গড়িমসি করে তাদের দায়িত এড়িয়ে গেছে।

প্রথম বামফ্রন্ট সরকার তার মেয়াদের প্রথম দু'বছরের মধ্যেই বার বার এ রকম নেতিবাচক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিল। এ দিকে সঞ্চয়িতা সংস্থাটিও ফুলে-ফেঁপে ওঠার উপক্রম, অন্য সংস্থাগুলিও উৎসাহিত হচ্ছে। এর মধ্যেই তারা ভুল বুঝিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকা তুলে নিয়েছে। এ ধরনের ঠগবাজির প্রকরণ বিদেশেও বহু পুরনো। পন্‌জি (Ponzi) প্রকল্প নামে এই কুখ্যাত পদ্ধতি মানুষের বিশ্বাসপ্রবণতার উপরে নির্ভর করে। সঞ্চয়িতার ব্যবস্থাপনাতেও প্রতি মাসে নতুন বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত টাকার একাংশ খামে পুরে পুরনো বিনিয়োগকারীদের হাতে জনে জনে তুলে দেওয়া হত, থাকত খুশি করার মতো সুদের টাকা। কিন্তু সংগৃহীত টাকার সিংভাগ যেত মালিক আর তার সাঙ্গোপাঙ্গদের পকেটে। এই জোচ্চুরি আর চলতে দেওয়া যায় না, এ রকম সিদ্ধান্তে আসার পর ফ্রন্ট সরকার ব্যবস্থাগ্রহণে উদ্যোগী হল। গোপনীয়তা বজায় রাখতেই হবে, কারণ সরষের মধ্যেই ভূত ছিল, প্রশাসন আর পুলিশের মধ্যে দালালের অভাব নেই। একমাত্র অর্থমন্ত্রী ও অর্থসচিব নিজেদের মধ্যে নিজেদের মতো আলোচনা করে দ্রুত কর্মপন্থা স্থির করে নিলেন। অর্থ দফতরের অধীনে বিক্রয়কর যথাযথ আদায়ের লক্ষ্যে একটি ছোট পুলিশবাহিনী ছিল। সেটিকেই কাজে লাগানো হল, সাধারণ পুলিশের কাউকে কিছু জানানো হল না। সঞ্চয়িতার বিরুদ্ধে জনসাধারণের সঙ্গে প্রতারণা করার কিছু কিছু অভিযোগ দায়ের করে সংস্থাটির একটি-দুটি প্রধান দফতরে হানা দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রের মতো কাজ হল। সঞ্চয়িতার প্রতিটি দফতরে পর দিন থেকে আমানতকারীদের ভিড় কমে গেল, প্রত্যেকেই দাবি করছেন যে, অবিলম্বে বিনিয়োগের টাকা ফেরত চাই। মূল প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে গেল। যাঁরা সরকারি সতর্কবাণী সত্ত্বেও লোভের বশে টাকা ঢেলেছিলেন, তাঁদের বড় একটা অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। কিন্তু সরকারের তৎপরতায় রিসিভার বসিয়ে টাকার একাংশ উদ্ধার করে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া গেল। তা সত্ত্বেও জনসাধারণের চার-পাঁচ হাজার কোটি টাকা তছরুপ হল। কিন্তু তখন যদি রাজ্য সরকার এমন কড়া ব্যবস্থা না নিত, তা হলে হয়তো আরও কয়েক বছরে এই সংস্থাটি লোক ঠকিয়ে লক্ষ কোটি টাকা উপার্জন করত, যে-টাকা সাধারণ মানুষের ফেরত পাবার বিন্দুমাত্র আশা থাকত না। সঞ্চয়িতার পরেও এমন ঘটনা ঘটে এবং বামফ্রন্ট সরকার তার একটি-দুটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

হালে যেটা ঘটেছে সেটা মারাত্মক। যা গুজব শোনা যাচ্ছে, সারদা নামক যে গোষ্ঠীটি সমপ্রতি পাখা মেলেছে, জনসাধারণকে বঞ্চিত করে তার সংগ্রহ নাকি ইতিমধ্যেই পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা ছুঁয়েছে। এই পুরো টাকাটা সংস্থার মালিক একাই ভোগ করেছে, না কি তার আশেপাশে কিছু সহযোগী মহাপাপী আছে, এই মুহূর্তে সেটা একটা মস্ত প্রশ্ন। লক্ষ করার বিষয় হল যে, বর্তমান রাজ্য সরকার এ বিষয়ে কুটোটি নাড়েনি, প্রতিষ্ঠানটিকে যথেচ্ছ ফুলে-ফেঁপে উঠতে দিয়েছে। রাজ্য সরকারের কেষ্টবিষ্টুরা এদের অনুষ্ঠানে মঞ্চ আলো করে বসে থেকেছেন, টিভি ক্যামেরার সামনে হাসিমুখে মালিকের সঙ্গে গলাগলি করেছেন। বামফ্রন্টের আমলে তদন্ত করে এপক্ষ-ওপক্ষ কোনও পক্ষেরই কোনও রাজনীতিকের নাম পাওয়া যায়নি। তবে পুলিশ প্রশাসনের মধ্যে কিছু ব্যক্তির নাকি সঞ্চয়িতার সঙ্গে মাখামাখি ছিল, তাদের কোনও কোনও আপনজন নাকি নাম ভাঁড়িয়ে সঞ্চয়িতার জন্য ঘৃণ্যভাবে অর্থ সংগ্রহ করত। শোনা যায়, প্রধানত এই সন্দেহের বশেই তৎকালীন অর্থ মন্ত্রক প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার সময় পুলিশ প্রশাসনকে অন্ধকারে রেখেছিলেন। কিন্তু এই সারদা প্রতিষ্ঠানের বেলায় গোটা জিনিসটা আরও ভয়ঙ্কর। কারণ রাজ্যের শাসক দলের আগাপাশতলা এই কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। সারদার মালিকের সঙ্গে এই দলের নেতা-চাঁইদের মাখামাখি সুবিদিত; তার বহু সাক্ষ্যপ্রমাণ খবরকাগজের বিবরণে এবং টিভির চিত্রমালায় চিরকালের জন্য ধরা থাকবে।

রাজ্য সরকার সমস্ত ব্যাপারটা খতিয়ে দেখার জন্য কমিশন গঠন করেছে। যে-কোনও বিশদ অনুষ্ঠানের জন্য কমিশনকে নির্ভর করতে হবে রাজ্য পুলিশের ওপর; আমাদের গত দু'বছরের অভিজ্ঞতা এ সন্দেহ দৃঢ়বদ্ধ করবে যে, পুলিশ এই রাজ্য সরকারের রাজনৈতিক নেতৃত্বের কেনা গোলাম, আর একটা অংশের অসাধুতা এ অকর্মণ্যতারও তুলনা নেই, রাজ্যের শাসক দলের কারও বিরুদ্ধে সামান্যতম অভিযোগ নিয়ে তদন্ত করার সাহস থেকে তারা বিচ্যুত। সুতরাং, কমিশনের লীলাখেলাও শেষ পর্যন্ত প্রহসনে পরিণত হবার যথেষ্ট আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে।

একটি বিকল্প প্রস্তাব আমরা পেশ করছি। সারদা গোষ্ঠী আরও বেশ কয়েকটি রাজ্যে তাদের শাখাপ্রশাখা ছড়িয়েছে। সুতরাং চতুর্দিকে যাঁরা সর্বস্বান্ত হলেন, তাঁদের পক্ষ থেকে স্বচ্ছন্দে দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানানো সম্ভব। এত বড় কেলেঙ্কারি ঘটেছে যে, এমনকী সুপ্রিম কোর্টের নিজে থেকেই ব্যাপারটি খতিয়ে দেখার উদ্যোগ আদৌ অযৌক্তিক নয়।

এটাও যোগ করা যায় যে, কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে কয়েকটি দুর্নীতির অভিযোগে যেমন হয়েছে, সারদা গোষ্ঠীর ব্যাপারেও তেমনই সুপ্রিম কোর্ট নিজেই একটি অন্বেষক গোষ্ঠী তৈরি করতে পারেন। এই গোষ্ঠী কেবলমাত্র সুপ্রিম কোর্টের আজ্ঞাধীন হবে, অন্য কারও আওতায় থাকবে না। এই বিশেষ সতর্কতার একান্ত প্রয়োজন। আগামী বছর লোকসভার নির্বাচনে সংখ্যাধিক্য পেতে হলে বড় দলগুলিকে ছোট ছোট আঞ্চলিক দলের উপর নির্ভর না করে উপায় নেই, কাজেই কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার এ রাজ্যের শাসক দলকে চটাবার সাহস পাবে না। সি বি আই তো কেন্দ্রের আজ্ঞাবহ দাস। কাজেই সুপ্রিম কোর্টের উচিত হবে নিজের আস্থাভাজন দক্ষ পুলিশবাহিনী দিয়ে সারদা গোষ্ঠীর ব্যাপারে অনুসন্ধান চালানো।

যারা গরিব সাধারণ মানুষকে হাজার হাজার কোটি টাকা ঠকিয়ে নিজেদের বিত্তবান করেছে এবং করছে, তাদের কোনও ক্ষমা নেই। তারা যে-ভেক ধরেই থাকুক না কেন, তাদের প্রতি নির্মম হওয়াই সামাজিক কর্তব্য ও দায়িত্ব। এই বিরাট পাপ-ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত প্রধান আসামি তার কয়েক জন শাগরেদের সঙ্গে পুলিশের জালে ধরা পড়েছে। নিজের অপরাধ যথাসম্ভব লঘু করার তাগিদে সে হয়তো তার পাপচক্রের সঙ্গে প্রধানত আর যারা-যারা যুক্ত, তাদের নাম উল্লেখ করতে তৎপর হবে; এই তালিকায় রাজ্যের শাসক দলের বেশ কয়েক জন চাঁইয়ের নাম না থাকাটাই হবে আশ্চর্যের ব্যাপার। মূল অপরাধীটিকে তাই রাজ্য পুলিশের জিম্মায় রাখা আদৌ উচিত নয়। যতদিন সে রাজ্য পুলিশের আওতায় আটকা থাকবে, তাকে স্তব্ধ করবার জন্য নানা রকম ছলচাতুরির আশ্রয় নেওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি, এমনকী প্রতিটি মুহূর্তে তার জীবন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা। এই পরিস্থিতিতে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের কাছে অবিলম্বে আবেদন পেশ করা উচিত, যাতে দেশের সর্বোচ্চ আদালত তার নিরাপত্তার দায়িত সুনিশ্চিত করতে বিকল্প ব্যবস্থার নির্দেশ অনুগ্রহ করে অতি দ্রুত ঘোষণা করেন। প্রধান প্রধান অপরাধীদের মধ্যে কেউই যাতে আইনকে ফাঁকি না দিতে পারে, তার জন্যই এই বিকল্প ব্যবস্থার প্রয়োজন।

---

৩ মে, ২০১৩, আনন্দবাজার পত্রিকায় 'একটি কাহিনি এবং একটি প্রস্তাব' শিরোনামে এই নিবন্ধ প্রথম প্রকাশিত, যা পরে অশোক মিত্র লিখিত 'অমিত্রাক্ষর এবং' বইতে পুনর্মুদ্রিত হয়।

Our Tribute to an
Outestanginhg Personality

Long live Ashok Mitra

Lezona Tieup Private Limited
Room No. 7, 7th Floor
AMP Baishakhi Mall
Kolkata – 700 091

Issue date 16 May 2018. Registered No. KOL RMS/455/2016-2018
Registered with the RNI NO. WBBEN/2013/49896.
Vol. 6, Issue 10 Arek Rakam

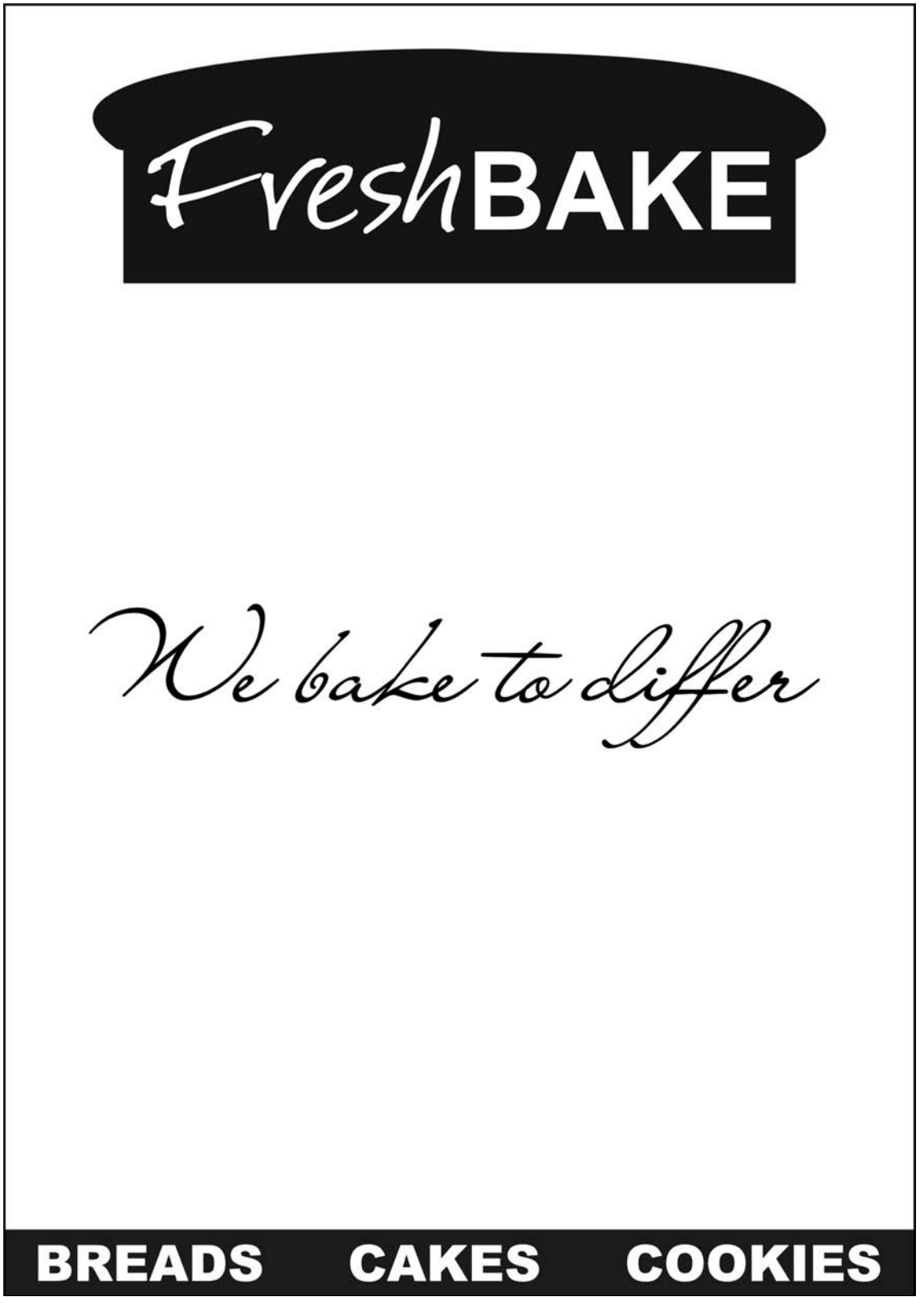

Published by Trishitananda Roy on behalf of Samaj Charcha Trust from Flat 3A, 8/2A Alipore Park Road, Kolkata–700 027 and printed by him at S. P. Communications Pvt. Ltd., 31B Raja Dinendra Street, Kolkata–700 009.